ঢাকার বাইসি উপাখ্যান

আরিফ নজরুল সম্পাদিত

BanglaBook.org

আরিফ নজরুলের জন্ম ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন। বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলাধীন ঠাকুর মল্লিক গ্রামে। বাবা আবদুল ওয়াজেদ আলী খান। মা নূরজাহান বেগম। কিশোরবেলা থেকেই লেখালেখিতে হাতেখড়ি। লিখছেন, ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধসহ সাহিত্যের নানা বিষয়।

তার প্রকাশিত উল্ল্যেখযোগ্য গ্রন্থ, ষড়রিপুর ষড়যন্ত্র [কবিতা], মেঘ বৃষ্টি ও পাখির পদাবলি [কবিতা], মনপোড়া বসতবাড়ি [কবিতা], বাতাশসমগ্র [কবিতা], হেঁটে যাই বনবেড়ালির সাথে [কবিতা], রৌদ্রস্নাত বৃক্ষজীবন [কবিতা যৌথ], যে নামে কাঁপছে ঠোঁট [কবিতা], এক যে ছিলো পুতুলরানি [ছোটদের গল্প], নোনাজল [গল্প], বাংলাদেশের শত মণীষী [জীবনীগ্রন্থ]।

সাহিত্যে স্বীকৃতি স্বরূপ পেয়েছেন, কবি বন্দে আলী মিয়া স্মারক সম্মাননা ২০০৭, ড. সিকান্দার হায়াত খান ইউসুফজাই সম্মাননা ২০১০, অতীশ দীপঙ্কর স্বর্ণপদক ২০১১, মাদার তেরেসা গোল্ডমেডেল ২০১২, ভাষাসৈনিক মাদার বখ্‌শ স্মৃতি পদক ২০১৩, মহাত্মা গান্ধী শান্তি পুরস্কার ২০১৩।

নৃত্যশিল্পী সোবানা'র ছবি অবলম্বনে

প্রচ্ছদশিল্পী : তাবাচ্ছুম মেহরীন

বাঙালি

Rokomari.com
ঢাকার বাইজি উপাখ্যান
আরিফ নজরুল
180730#IG-17
153514#362856-3

www.BanglaBook.org

ঢাকার বাইজি উপাখ্যান

আরিফ নজরুল সম্পাদিত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাঙালি

ঢাকার বাইজি উপাখ্যান
আরিফ নজরুল সম্পাদিত
দ্বিতীয় মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি ২০১৯
প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ২০১৭
নৃত্যশিল্পী সোবানা'র ছবি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: তাবাচ্ছুম মেহরীন
গ্রন্থস্বত্ব: লেখক
প্রকাশক: আরিফ নজরুল
বাঙালি
১/এ পুরানা পল্টন লাইন (৩য় তলা, রুম নং ২), পল্টন, ঢাকা ১০০০
মোবাইল: ০১৭১২০৯২৪৯২, ০১৫৩৪৬২১০১৫
E-mail: bangalibd71@gmail.com
মূল্য : ৩০০ টাকা

Dhaker Baijee Upakkhan
2nd Edition: February 2019
First Published: November 2017
Published in Bangladesh by Bangali
Dhaka 1000

Price Tk. 300 US $ 10

ISBN : 978-984-8077-00-9
ঘরে বসে আমাদের যে কোনো বই পেতে যোগাযোগ করুন :
www.rokomari.com/bangali
কল সেন্টার-১৬২৯৭ মোবাইল : ০১৫১৯৫২১৯৭১

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

উৎসর্গ

কবি গোলাম কাদের

সূচিপত্র

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে বারবনিতা-বাইজি-দেবদাসীদের অবদান
পূরবী বসু ১১
ঢাকার খেমটাওয়ালি ও বাইজিদের কথা
খন্দকার মাহমুদুল হাসান ৩৫
নারী ভাবনা: বাইজি গণিকা ঢেমনি
বিলু কবীর ৫১
ঢাকার বাঈজি
আনিস আহমেদ ৮৩
ঢাকার বাইজি উপাখ্যান
গোলাম কাদের ৮৭
'দ্য লাস্ট কিস' ঢাকার প্রথম নির্বাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র
অনুপম হায়াৎ ৯৯
হারানো দিনের ঢাকার বাইজি
মাহবুব আলম ওয়াকার এ খান ১০২
হারিয়ে যাওয়া বাইজি নাচ
স্বপন কুমার দাস ১১০
বাইজি উদ্ভবের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও শিল্পেসাহিত্যে বাইজি উপস্থিতি
শাফিক আফতাব ১১৫
'পদ্মপাতার জল' এক বাইজি প্রেমের উপাখ্যান
রাজীদ সিজন ১২০
বাইজিকথা
রহিমা আক্তার মৌ ১২৬
নান্দীকারের নাটক : নাচনি
শান্তি সিং ১৩৭

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

প্রসঙ্গ কথা

মানব সভ্যতার প্রারম্ভেই মনোতৃপ্তির জন্য বাদ্য, নৃত্য, সঙ্গীত, নাটকের প্রচলন ছিলো। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত সঙ্গীত, নৃত্য পটিয়সীদের উচ্চ বিত্তদের কাছে কদর ছিলো। ধ্রুপদী-নৃত্য-গীতে পারদর্শী সম্ভ্রান্ত রমনীদের বাই বলা হতো। শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতে পারঙ্গম বাইকে সম্মানসূচক বাইজি বলা হতো। বাইজিরা সম্রাট, সুলতান, বাদশা, রাজা, নবাব, ধর্নাঢ্য ব্যাক্তি ও জমিদারদের রঙমহলে শাস্ত্রীয় নৃত্য পরিবেশন করতেন। বিনিময়ে তারা অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সার্ধশত বছর আগে ঢাকায় নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাইজিরা কলকাতা হতে ঢাকায় আসেন। তারাই নাচ, গান, চলচ্চিত্র ও নাট্য শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সেইসব বাইজিদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঢাকার পৌরানিক ইতিহাস। আজ নেই নবাবদের রঙমহল। বাইজিরা তাই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। হারিয়েছে তাদের ঐতিহ্য-সম্মান। নতুন প্রজন্মকে সেইসব বাইজি জীবনের ইতিকথা জানানোর জন্যই আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। আমার দৃঢ় প্রত্যয় বইটি পাঠকের কছে সমাদৃত হয়ে আনন্দ সঞ্চারের পাশাপাশি ইতিহাসের সম্যকজ্ঞান উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

BanglaBook.org

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে বারবনিতা-বাইজি-দেবদাসীদের অবদান

পূরবী বসু

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে অতি প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে অন্তত বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সমগ্র বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে সবচেয়ে দৃশ্যমান, সক্রিয়, সাবলিল, শিক্ষিত, সচল এবং বিশেষত শাস্ত্রীয় সংগীতে ও নৃত্যে পটিয়সী অধিকাংশ নারীই ছিলেন বাইজি, বীরঙ্গণা অথবা মন্দিরের দেবদাসী কি সেবাদাসী। অর্থাৎ তারা অধিকাংশ-ই অন্তপুরের নারী ছিলেন না। বাগানবাড়ি, পন্ডিতালয়, বাইজিবাড়ি, মন্দির কিংবা বাজারে কি বন্দরে ছিল তাঁদের কর্মতৎপরতা। বঙ্গ সংস্কৃতির কোনো কোনো ক্ষেত্রে (শাস্ত্রীয় সংগীত ও নৃত্য এবং অভিনয়ে) এই বাইজি-স্বৈরিণীরা বঙ্গে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন। নাম করা সব ধনী রাজা, নবাব, সওদাগর, জমিদাররা তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নিজেদের জৌলুস ও

BanglaBook.org

আধিপত্য প্রদর্শনে জমিদার-নবাবরা তাঁদের বাগানবাড়িতে সংগীত-নৃত্যে বিশেষ পারদর্শী খ্যাতনামা বাইজিদের এনে রাখতেন। কিংবা তাঁদের আমন্ত্রণ করে বিশেষ এক রাতের জন্যে নিয়ে আসতেন নিজেদের বেলোয়ারি ঝাড়ে সজ্জিত জলসাঘরের উজ্জ্বল আলোর উৎসবে। সেখানে অন্যান্য সৌখিন ও উচ্চবিত্তের লোকদের উপস্থিতিতে সারারাত ধরে চলতো গানবাজনা ও খানাপিনা। গেয়ে, নেচে বাইজিরাও পেতেন প্রচুর অর্থ।

শিল্পকলায় বিবিধ গুণের মধ্যে, অভিনয়ে, নৃত্যে, বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শিতায়, চিত্র অঙ্কণ এবং চিত্রশিল্প তারিফ করার ক্ষমতায়, গানের কথা তৈরি এবং সুর দেবার দক্ষতায়, সুচারুরূপে গৃহসজ্জায়, নান্দনিক প্রসাধন-চর্চায় ও কেশ-বিন্যাসে , মনোহর রান্নার দক্ষতায়, সূক্ষ্ম ধাঁধা তৈরি এবং ধাঁধা সমাধানের ক্ষমতায়, লেখা-পড়ার সক্ষমতায়, মুখে মুখে তাৎক্ষণিকভাবে দু'লাইনের পদ্য বানিয়ে জবাব দেবার, কবিতা ও গল্প তৈরি করা এবং লিখতে পারার দক্ষতায়, বিভিন্ন রত্ন চেনার ক্ষমতায়, তাস, পাশা ও জুয়া খেলার পারদর্শিতায়, জড়তাহীনভাবে সাবলিল কথাবার্তা বলা ও নিজের মত প্রকাশের দক্ষতায়, চোখ-ভুরু বা মুখের বিশেষ ভঙ্গিতে কথা না বলেও মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান, যোগ্যতা, ও নৈপুণ্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই একজন গণিকা চৌষট্টি কলার বিশারদ হয়ে তাঁর পেশায় যোগ দিতে পারতেন। অন্তত প্রাচীন ভারতে এই স্তরে পৌঁছানো রীতিমতো দ্রুহ ও সময়সাপেক্ষ একটি সাধনা ছিল। আর এভাবেই রাষ্ট্রের বাইজি-বারবনিতারা তাঁদের পেশাটিকে একটি শিল্পে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইসব গুনাবলী এবং শিল্পকলার সাথে এই নারীদের আবার ব্যবসা ধরে রাখার স্বার্থে কিছু বিশেষ পদ্ধতি রপ্ত করতে হতো। যেমন, দাঁড়াবার বিশেষ মোহন ভংগী, দৃষ্টিপাতের কটাক্ষ আয়ত্বে আনা, কথার আবেশে বশ করার দক্ষতা অর্জন, কামকলাপারদর্শী হয়ে ওঠা ইত্যাদি। আসলে বহুমুখী শিল্পচর্চার সাথে সাথে কামের ষোলো আচারও তাদেরকে শিখতে হতো। অর্থাৎ কোনো নারী যখন অনন্য বা অসাধারণ কোনো গুণে ভাস্মর হয়ে

BanglaBook.org

উঠতেন, পিতামাতা থেকে সমাজপতিরা মনে করতেন সাধারণ ঘরসংসার করা বা একজনের মনোরঞ্জনে জীবন কাটানো সেই নারীর জন্যে চূড়ান্ত এক অপচয়। তার বিশেষ গুণাবলি আরো অনেকের মধ্যে সমাদৃত হবে, সমাজে অনেক বেশি মানুষের মনোরঞ্জন করতে তারা সক্ষম হবে, তাদের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, সেই সঙ্গে হবে অর্থের সমাগম, প্রত্যাশা এটাই। অথবা কোনো এক দেবতা ও তার পূজারীর কাছে সমর্পিত হবার ভাগ্য নিয়েই এই বিশেষ কলায় পারদর্শী হয়ে উঠেছেন বলে সেইসব নারীদের পিতামাতা নিজেরা সঙ্গে করে কন্যাকে নিয়ে এসে দেবালয়ে এনে রেখে যেতেন, যেখানে নেচে, গেয়ে এবং অতিথিদের সেবা আর আপ্যায়ন করেই জীবন কাটতো তাদের।

প্রাচীন ভারতের গণিকারা পরিচিত হতেন বিভিন্ন নামে এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেণিভাগ ছিল। সাধারণত ৬ ভাগে বিভক্ত ছিলেন তাঁরা-

১. রাজবেশ্যা (রাজার অনুগৃহিতা গণিকারা)

২. নাগরীবেশ্যা (নগরবাসিনী গণিকা)

৩. গুপ্তবেশ্যা (সদ্বংশীয় নারী যে গোপনে অভিসার করে)

৪) দেববেশ্যা (মন্দিরের দেবদাসী)

৫. ব্রহ্ম বেশ্যা বা তীর্থতা (যারা তীর্থস্থানে থাকেন)

৬. সাধারণ গণিকা।

তখনকার দিনেও, আজকের মতো-ই, পতিতাবৃত্তির প্রধান ও মৌলিক কারণ ছিল অর্থনৈতিক। এটি নারীর জীবিকানির্বাহের একটি উপায় বলে সমাজ মেনে নিতো। ফলে পতিতা বৃত্তি নিন্দনীয় বা ঘৃন্য কোনো পেশা বলে বিবেচিত হতো না তখন। জীবিকা নির্বাহের অন্যতম উপায় এবং বিনোদনমূলক পেশা হিসেবে গ্রহণ করা হতো সমাজে।

বিক্রমাদিত্য-কৌটিল্যের (চানক্য বলেও পরিচিত) কালে গণিকারা রীতিমতো রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেতেন। গণিকা, গণিকালয় ও

BanglaBook.org

সেখানকার ক্রিয়াকর্মের জন্যে বিভিন্ন নিয়মাবলি পরিচ্ছন্নভাবে লিপিবদ্ধ ছিল– সেবাদানকারী ও গ্রহিতা উভয়ের জন্যেই। কৌটিল্যের শাস্ত্র অনুযায়ী 'গণিকার রূপ নষ্ট হয়ে গেলে তাকে ধাত্রীর পদে নিযুক্ত করতে হবে।

গণিকা ও দাসী যখন ভোগের অযোগ্য হবে তখন তারা কাজ করবে রান্নাঘরে। 'তার মানে কৌটিল্য গণিকাদের পেশা থেকে অবসর নেবার পরে তাঁদের পুনর্বাসনের দায়িত্বও রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন, কেননা তখনকার দিনে রাষ্ট্র ইচ্ছে করলে নারীকে গণিকায় পরিণত করতে পারতো। আম্রপালিকে তো অপরিসীম সুন্দর হবার কারণে রাষ্ট্রীয় আদেশের বলে বারবনিতা হতে হয়েছিল। যুক্তিটা ছিল এই রকম। আম্রপালি এতো বেশি সুন্দর ও আকর্ষনীয় যে সে কেবল একজন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে পারেন না- হওয়া উচিত নয়। সেটি হবে দারুণ অপচয়। শুধু তাই নয়, তাঁর মতো দেহবল্লভীর অধিকারী এক মেয়ে রাষ্ট্রের কোনো এক বিশেষ পুরুষের স্ত্রী হলে অন্য পুরুষদের মধ্যে তাঁর জন্যে রীতিমতো যুদ্ধ বেঁধে যাবে। ফলে আম্রপালিকে রাষ্ট্র নিযুক্ত করে নগরবধূ হিসেবে। এখানে আম্রপালির নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা-মতামতের কোনো মূল্য নেই। রাষ্ট্রের আদেশে বারবনিতা হয়ে আম্রপালি বহু ক্ষমতাধর পুরুষের সঙ্গে দৈহিক মিলনে মিলিত হয়েছেন– এমন কি দেশের শত্রু ভীনদেশের রাজাও আম্রপালির প্রেমে উন্মত্ত হয়ে তাঁর ঘরে আসতে ও থাকতে শুরু করেন।

অতীতে ভারতের রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে 'বাই' শব্দ বলতে বোঝানো হতো ধ্রুপদী নৃত্য ও গীতে পারদর্শী সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীদের। খুব ছোট বেলাতেই এই মেয়েরা ওস্তাদদের কাছে তালিম নিয়ে নৃত্য ও গীত শিখতে শুরু করতেন। শিক্ষা শেষে শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করলে লোকে তাদের সম্বোধন কালে 'বাই' শব্দটির সঙ্গে সম্মানসূচক 'জি' শব্দটি জুড়ে দিত। তখন থেকে 'বাইজি' শব্দটি বর্তমানে লব্ধ বড় কেনো ডিগ্রীর মতো তাঁদের নামের শেষে শোভা পেতো। বাইজিরা সম্রাট, সুলতান, বাদশা, রাজা, নবাব, জমিদার ও

BanglaBook.org

সম্ভ্রান্ত-সম্পদশালী সমাজ-নেতাদের বাগানবাড়ি, জলসাঘর কিংবা রঙমহলে শাস্ত্রীয় নৃত্যগীত পরিবেশন করে অনেক পরিমাণে অর্থ ও খ্যাতিলাভ করতেন অর্থ আয়ের জন্য তারা বাইরে গিয়ে 'মুজরো' আসরে গান গাইতেন ও নাচতেন। আবার তাঁদের নিজেদের ঘরেও 'মাহফিল' বসাতেন।

উত্তর ভারত বিশেষ করে লক্ষ্ণৌ, বানারস, পাটনা থেকে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে বাংলায়, বিশেষ করে কলকাতায় এবং কিছু পরিমাণে ঢাকায় আগমন ঘটতে থাকে বাইজিদের। শোনা যায়, অযোধ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ তখন কলকাতায় এসে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করেই সেখানে সংগীত সভা গড়ে ওঠে। আর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক বাইজির আগমন ঘটে। বেশির ভাগ বাইজিই রাগসংগীতে ও শাস্ত্রীয় নৃত্যে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত শিল্পী তখন। কথিত আছে প্রথমে বাইজির কণ্ঠে গান শোনার ব্যাপারে আপত্তি থাকলেও, একবার স্বামী বিবেকানন্দ এক বাইজির গান শুনে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন।

ঢাকায় বাইজিদের নাচ-গান শুরু হয় মোগল আমলে। সপ্তদশ শতাব্দীতে সূচনা হলেও উনিশ শতকে ঢাকার নবাবদের আমলে বাইজিদের নাচ-গান এবং মেহফিল– এর জোয়ার আসে। তারা আহসান মঞ্জিলের রংমহল, শাহবাগের ইশরাত মঞ্জিল, দিলকুশার বাগানবাড়িতে নৃত্য-গীত পরিবেশন করতেন। ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব বাইজি খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন লক্ষ্ণৌর প্রখ্যাত গায়ক ও তবলাবাদক মিঠন খানের নাতি সাপান খানের স্ত্রী সুপনজান। সুপনজান উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকায় ছিলেন।
সেকালে ঢাকার গানের আসরে ছিল বহু সমঝদার শ্রোতার আগমন। শোনা যায়, ঢাকায় গান করতে আসার আগে ইন্দুবালা কলকাতায় কালী ঘাটে যেয়ে মন্দিরে প্রার্থনা করেছিল, 'মা ঢাকা যাচ্ছি, ঢাকা তালের দেশ, মান রাখিস মা'। তাল যেন কাটা না যায় এটাই ছিল ইন্দুবালার প্রার্থনা।

BanglaBook.org

কণ্ঠসংগীতের ওস্তাদ হুসেন মিয়া ঢাকার অনেক বাইজিকে তালিম দিয়েছিলেন। পূর্ববাংলার বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে ঢাকার বাইজিদের আমন্ত্রণ জানানো হতো। বহিরাগত অনেক বাইজি ঢাকায় দীর্ঘদিন থেকে গেছেন। কেউ কেউ স্থায়ীভাবে, কেউ কেউ আবার ঘুরেফিরে ঢাকায় আসতেন। এসব অস্থায়ী বাইজির পাশাপাশি স্থানীয় মেয়েরাও বাইজির পেশা বেছে নিত। সংগীতের পুরোনো কেন্দ্র হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকায় ছিলেন কয়েকজন অতি গুণী বাইজি। ঢাকায় বাইজিদের পাশাপাশি খেমটাওয়ালিদের-ও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল।

বাইজি নাচ-গান আর খেমটা নাচ-গানের মধ্যে পার্থক্য আছে। খেমটা হলো হালকা ধরনের এবং আদিরসাত্মক নৃত্য। এই নাচ সাধারণত বাইজিরা এককভাবে নাচতেন। এককভাবে সংগীত-ও পরিবেশন করা হতো খেমটা নাচের সঙ্গে। বাইজি ও খেমটা নাচের মূল পার্থক্য হলো খেমটা নাচের মধ্যে পায়ের কাজটিই প্রধান। আর নাচের ধরন দিয়ে যৌন আবেদন সৃষ্টি করা একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে 'বাইজি নাচে প্রধান ছিল হাতের ছন্দময় দোলা এবং মুখ, চোখ, নাক ও ঠোঁটের সূক্ষ্ম কম্পন' ও বিভিন্ন ভাবপ্রকাশের আয়োজন। বাইজিদের পোশাক ছিল চুড়িদার পাজামা-ওড়না, পায়ে চিকন ঘুঙুর। সত্যেন সেন লিখেছেন, 'খেমটাওয়ালিরা জাতে উঠত বাইজি হয়ে'।

বাইজি নাচ ও খেমটা নাচ সেকালে ঢাকার মানুষদের জীবনের অংশ হয়ে পড়েছিল। কবি নবীন চন্দ্র সেন তার ছেলের বিয়েতে ঢাকা থেকে বাইজি আনতে পেরে অত্যন্ত গর্ব অনুভব করেছিলেন। গান আর নাচে খুব দক্ষ না হলে সে কালে ভালো বাইজি হওয়া যেত না। তার সাথে অবশ্যই থাকতে হতো সুরূপের মহিমা।

বাইরে থেকে ঢাকায় আসা বিখ্যাত বাইজিদের মধ্যে জদ্দন বাই, মুশতারী বাই ও উপমহাদেশের সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত বাইজি গওহরজান এর ঢাকায় মেহফিল অংশ গ্রহণ করা ও শ্রোতাদের মাতিয়ে তোলার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গানের সুমধুর কণ্ঠ, বিশেষ গায়কী ভঙ্গি এবং গ্রামোফোন রেকর্ডিং এর একেবারে প্রথম

BanglaBook.org

দিকের শিল্পী হিসেবে প্রচুর রেকর্ড করে গওহরজান বাংলা সংগীত ভূবনে এক কিংবদন্তি। তাঁকে গ্রামোফোন রেকর্ডের সম্রাজ্ঞী-ও বলা হয়ে থাকে। গওহরজানের মা বিখাত বাইজি মালকাজান। সত্যেন সেনের লেখায় মালকাজান সম্বন্ধে জানা যায়। গওহরজানের মা মালকাজান মুজরো করতে ঢাকা আসতেন। সে সময় তিনজন মালকাজান ছিলেন।

আগ্রাওয়ালী মালকাজান, বেনারসের চুলবুলিয়া মালকাজান ও ভাগলপুরী মালকাজান। গওহরজান ছিলেন বেনারসের চুলবুলিয়া বা বড় মালকাজানের কন্যা। গওহরজানে পিতা রবার্ট উইলিয়াম ইয়োয়ার্ড ছিলেন ইহুদি। মা রুকিমণী ছিলেন ভারতীয়। বিবাহের পর রুকিমণীর নাম হয়েছিল ভিক্টোরিয়া। এঁদের একমাত্র কন্যার নাম রাখা হয়েছিল অ্যাঞ্জেলিনা। অসামান্য রূপসী ভিক্টোরিয়া ও রবার্টের সংসার বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। উভয়ের ভিতর ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর, ভিক্টোরিয়া খুরশিদ নামক একজন মুসলমান যুবকের সাথে বানারসী শহরে আসেন। এখানেই মা ও মেয়ে উভয়েই ধর্মান্তরিত হন।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর ভিক্টোরিয়ার নাম হয় মালকাজান এবং অ্যাঞ্জেলিনা নাম হয় গহরজান। এরপর মালেকাজান বাইজি বৃত্তি গ্রহণ করে। আধুনিক নায়িকাদের মতো সেকালে মালকাজানের ছবি অধিকাংশ ঘরেই টাঙানো থাকত, এতটাই ছিল তার রূপ। মালকাজানের কিছু রেকর্ড বের হয়ে ছিল। ওদিকে গওহরজান বড় হলে ভারতের বাইজি মহলে সম্রাজ্ঞীর আসনে আরোহন করেছিলেন। একে ছিলেন অসামান্য সুন্দরী, তার ওপরে ছিলেন অত্যন্ত গুণী শিল্পী।

১৯০২ সালে গ্রামোফোন রেকর্ডিং শুরু হলে প্রথমেই গওহরজানের বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া গানের রেকর্ড বের হয়। গওহরজান ছিলেন ভীষণ শৌখিন আর ফ্যাশন সচেতন। নিজেকে সব সময়ই সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করতেন।

এ দেশে শিল্পীদের ফ্যাশন সচেতনতা গওহরজানের হাত ধরেই আসে। তার গানের রেকর্ড ছিল খুব-ই জনপ্রিয়। তিনি কিছু গানও

BanglaBook.org

রচনা করেছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের গুরু ওস্তাদ জমির উদ্দিন গওহরজানের শিষ্য ছিলেন। গওহরজানের মা মালকাজানের সৎবোন ছিল জদ্দন বাই। জদ্দনের মা ইসলাম গ্রহণ করে আর জীবিকার কারনে মেয়েকে বাইজি হিসাবে তৈরি করে। জদ্দন বাই বেশ কয়েকবার বিয়ে করেন। তিনি ঢাকার বিভিন্ন মেহফিল মাতিয়ে রাখতেন।

ঢাকার নবাবের-ও খুব ঘনিষ্ট ছিলেন জদ্দন বাই। জদ্দনের শেষ স্বামী উত্তম চাদ মোহন। জদ্দনের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন মোহন এবং জদ্দনকে বিয়ে করেন। মোহন নিজের নাম বদলে রাখেন আবদুর রশীদ। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এ বিয়েতে সাক্ষী হন। মোহনের সঙ্গে বিয়ের পরে জদ্দন বাইজি পেশা ছেড়ে চলচ্চিত্রের সাথে যুক্ত হন। রশীদ আর জদ্দানের ঘরে জন্ম নেন ভারতের চিত্র জগতের কিংবদন্তীতুল্য অভিনেত্রী নার্গিস। তার মানে নার্গিস ও গওহরজান খালাতো বোন।

গওহরজান অত্যন্ত বিত্তবান নারী ছিলেন। শোনা যায় তিনি ২০ টি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীর অন্যতম প্রথম শিল্পী গওহরজান ৬০০ মতো গানের রেকর্ড করেন। কেবল সংগীত, ফ্যাশন আর নানা ভাষায় পারদর্শীতাই নয়, তাঁর স্বদেশানুরাগ-ও ছিল প্রখর।

মহাত্মা গান্ধী যখন একবার জনহিতকর কাজের জন্যে তাঁর কাছে অর্থ চাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ১২ হাজার টাকা দিয়ে দেন। ওই টাকায় তখন ১২০ তোলা সোনা কেনা যেতো। তিনি তাঁর জীবনভর অর্জিত প্রায় সকল অর্থ-ই দান করে গেছেন। সারা জীবন একটি মনের মানুষের খোঁজ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তা তিনি পাননি। পরের দিকে যার সঙ্গে ভালোবাসা করলেন, তাকেও চিনতে হলো অত্যন্ত নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। ভালোবাসার অভিনয় করে গওহরের তথাকথিত প্রেমিক আব্বাস তাঁর ধনসম্পত্তি সব কেড়ে নেয়।

BanglaBook.org

'ফার্স্ট ড্যান্সিং গার্ল' নামে পরিচিত গওহরজান শুধু গায়িকা ও নৃত্যশিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন স্বয়ং কবি ও গানের শিক্ষক। অনেকেই জানে না, বিখ্যাত 'রসকে ভরে তোরে নয়ন' ঠুমরিটি গওহরজান এর-ই লেখা। কোনো সভায় গেলে বিভিন্ন ভাষা-ভাষির শ্রোতাদের জন্য তাদের ভাষাতেই গান শোনাতেন গওহরজান। যেমন জলসায় বাঙালি শ্রোতা পেলে বাংলা ভাষাতেই গান শোনাতেন। তাঁর কাব্য প্রতিভা হয়তো মায়ের কাছে পাওয়া। মালকাজানও ছিলেন বড় কবি। নিজের রচিত বাংলা গানও শোনাতেন গওহরজান জলসাতে। শ্রোতাদের রবীন্দ্রনাথের গানও শুনিয়েছেন। তাছাড়া নিজের লেখা গানতো আছেই। সেরকমেই একটি নিজের লেখা গান এলো রেকর্ডে। 'ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল আর এলো না'। নিজের ভালোবাসার ব্যার্থতাই যেন গভীর ভাবে বর্নিত এই গানে। শেষ বয়সে আব্বাসের নিষ্ঠুর প্রতারণায় কষ্টার্জিত প্রচুর ধনসম্পদের সব হারিয়ে মাসিক মাত্র ৫০০ টাকা বেতনে মহীশূরের রাজদরবারে গান গাওয়ার একটি চাকরি নিয়ে মহীশূর চলে যান, এবং সেখানে কোনো রকমে জীবন ধারণ করতে থাকেন। ১৯৩০ সালে মহীশূরেই তিনি মারা যান।

মুশতারী বাই তার পূর্ব মধুর কণ্ঠস্বর ও সুরের জাদুতে বশ করতেন শ্রোতাদের। ১৮৭০ সালে ঢাকার নবাব আব্দুল গনির আমন্ত্রনে শাহবাগের বাগান বাড়িতে এসে গান গেয়ে মুগ্ধ করেছিলেন সে কালের বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক আবদুল গাফফার নাসকান কে। কলকাতায় তার গান শুনে আত্মহারা হয়েছিলেন রাঁইচাদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র, কবি নজরুল ইসলাম, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত বিদগ্ধ ব্যক্তিরা।

কলকাতার একটি আসরে মোস্তারী বাই পূরবী রাগে খেয়াল গেয়ে সুরের ঝংকার ও মদিরাতে শ্রোতাদের এমন আচ্ছন্ন করেছিলেন যে ওই আসরে পরবর্তী শিল্পী বিখ্যাত ফৈয়াজ খাঁ, এনায়েত খাঁ ও হাফেয খাঁ মঞ্চে উঠতেই অস্বীকৃতি জানালেন।

লাল চাঁদ বড়ালের গুরু বিশ্বনাথ রাওয়ের ছাত্রী ছিলেন গণিকা-কন্যা মানদা। ল্যান্স ডাউন রোডে নাটোর হাউসে বিখ্যাত ফৈয়াজ খাঁর সাথে একসঙ্গে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন ১৯২৭

BanglaBook.org

সালে যা এর আগে কল্পনাই করা যেত না। জনসম্মুখে পুরুষ নারীর একত্রে শাস্ত্রীয় সংগীত পরিবেশনা, যতদূর জানা যায় সেটাই প্রথম। মানদার ৫০ টির মতো রেকর্ড আছে তার মধ্যে ৩ টি রবীন্দ্রসংগীত। উপমহাদেশে পুরুষদের সাথে পাল্লা দিয়ে নারী শিল্পীদের চলা এই সময় থেকেই মূলত শুরু।

এছাড়া পাটনা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন আবেদী বাই। ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন তিনি, যেমন করেছিলেন আরো অনেক গুণী বাইজি। আবেদির তিন কন্যা আন্নু, গান্নু ও নওয়াবীন। এই তিন বোন নওয়াব আবদুল গনির দরবারে নিয়মিত নাচতেন, গাইতেন এবং মাসোহারা নিতেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুনাম করেছিলেন নওয়াবীন। তিনি ১৯৪৫-৪৬ সাল পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং ছিলেন ঢাকায়। মুনতাসীর মামুনের কথানুসারে, এই তিন বোনই 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভাড়া করে ১৮৮০ সালের নভেম্বরে টিকিটের বিনিময়ে 'ইন্দ্রসভা' নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। ঢাকায় নারীদের নিয়ে এটিই ছিল প্রথম নাট্যাভিনয়। এলাহাবাদ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন জানকী বাই। তিনি এক একটি মুজরোতে তখনকার দিনের দেড় হাজার টাকা করে নিতেন। তিনিই সম্ভবত সবচেয়ে বেশি সম্মানী পেতেন। জানকী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী এবং এক নবাবের অতি প্রিয় রক্ষিতা। কেউ যেন জানকীকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে না পারে সেজন্যে জানকিকে একটু কুৎসিত করার জন্যে নবাব ৫৬ বার ছুড়ি দিয়ে আঘাত করেছিলেন জানকিকে। এজন্যে জানকি ৫৬ ছুড়ি বলেও পরিচিত।

ঢাকার আরেক প্রখ্যাত বাইজি হলেন আচ্ছি বাইজি। নৃত্য ও গীতে সুনিপুণা আচ্ছি ছিলেন নওয়াব আবদুল গনির সবচেয়ে নামকরা বাইজি। আচ্ছি বাই তখনকার দিনে ছিলেন অনেকের ওস্তাদ। লক্ষ্মৌ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন তিনি। হাকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন যে ঢাকায় আচ্ছি বাইয়ের মতো বড় নর্তকী আর কেউ আসেননি।

আমিরজান বাইজি ছিলেন উনিশ শতকের ঢাকার বিখ্যাত গায়িকা ও নর্তকী। জিন্দাবাহারের রাজলক্ষ্মীও ছিলেন ঢাকার আরেক বিখ্যাত

BanglaBook.org

বাইজি। জিন্দাবাহারে তাঁর পাঁচ-ছয়টি বাড়ি ছিল। সংগীতশিল্পীর চাইতেও দান-ধ্যানের জন্য তিনি ছিলেন বেশি পরিচিত ও সম্মানিত।

১৮৮৬ সালে ভূমিকম্পের পর জিন্দাবাহারের কালীবাড়ি ভেঙে গেলে তা মেরামত করে দেন তিনি। রমনার কালীবাড়ির শ্রী বর্ধনেও তিনি প্রচুর চাঁদা দিয়েছিলেন।

মুনতাসীর মামুন আমিরজান ও রাজলক্ষ্মীর দান-দাক্ষিণ্যের মানসিকতার কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, ১৮৭৪ সালে নওয়াব আবদুল গনি ঢাকা শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থাপনার জন্য এক বৈঠকের আয়োজন করেন। সেই বৈঠকে রাজা-মহারাজা জমিদার ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই দুজন বাইজিও উপস্থিত ছিলেন। নবাব পানি সরবরাহ প্রকল্পে সবাইকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে আহ্বান জানালে সাড়া দিয়েছিলেন মাত্র দুজন। আমিরজান ও রাজলক্ষ্মী বাইজি তারা প্রত্যেকে ৫০০ টাকা করে দান করতে রাজি হয়েছিলেন। নবাব অবশ্য কারও কাছ থেকে কোনো সাহায্য না নিয়ে পরে নিজেই এক লাখ টাকা দান করেছিলেন।

বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকার সবচেয়ে বিখ্যাত বাইজি ছিলেন জিন্দাবাহার লেনের দেবী বাইজি বা দেবী বালা। খাজা হাবিবুল্লাহর বিয়ের অনুষ্ঠানে দেবী বাইজি ও অন্য এক বাইজি নাচ-গান করেছিলেন। দেবী বাইজি পরে প্রথম ঢাকায় নির্মিত পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র (নির্বাক) দ্য লাস্ট কিস-এ অভিনয় করেন। হরিমতি বাইজি ঢাকায় এসেছিলেন। তিনিও এই নির্বাক ছবিটিতে অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রে অভিনয় শেষে তারা আবার নিজ পেশায় ফিরে যান। দেবী বাইজি ঢাকার বিভিন্ন সংগীত সভায় একা এবং কলকাতার হরিমতি বাইজির সঙ্গে গান করেন।

ঢাকার বাইজিদের সময় বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকেই ফুরিয়ে যেতে থাকে। দেশ ভাগ ও জমিদার প্রথার উচ্ছেদ এঁদের পৃষ্ঠপোষকহীন করে ফেলে। ১৮৭৩ সালে কলকাতার মেয়েরা যখন রঙ্গমঞ্চে আসার অনুমতি পেলেন, তখন নিষিদ্ধ পল্লীর সংগীতে পারদর্শীরাই প্রথম মঞ্চে এসেছিলেন। তখন থেকে বিংশ শতাব্দীর

BanglaBook.org

ত্রিশের দশক পর্যন্ত সমস্ত অভিনেত্রীরাই সুগায়িকা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী থেকে বিংশ শতাব্দীর আঙুরবালা, ইন্দুবালা পর্যন্ত অনেকেরই নাম করা যায়। সুঅভিনেত্রী, সুগায়িকা কানন দেবী এখনো অনেকেরই প্রিয়।

মন্দিরে দেবদাসী বা সেবাদাসীরা মাতৃপ্রধান সমাজে সম্মানকর অবস্থায় ছিলেন। মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি 'গীতগোবন্দ' রচয়িতা জয়দেব গোস্বামীর পত্নী অত্যন্ত সুন্দরী ও নাচেগানে পারদর্শী পদ্মাবতী ছিলেন একজন দেবদাসী। মা-বাবা পদ্মাবতীকে সেবাদাসী করতে চাইলেও পদ্মাবতী জয়দেবকে বিয়ে করে সংসারী হন। একসময় দেবীর উদ্দেশে নাচ ও সংগীত পরিবেশনের জন্যে বিয়ে বা সংসার না করে দেবতালয়েই সারাজীবন পড়ে থাকতেন এই সেবাদাসী এবং দেবদাসীরা।

পরবর্তীকালে ধর্মালয়ে নারীর পরিবর্তে পুরুষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে এই সেবাদাসীদের কাজ হয়, দেবতার বা মন্দিরের বদলে পুরুষ পুরহিতদের এবং মন্দিরের ধনী পৃষ্ঠপোষকদের নাচ-গান দিয়ে বিমোহিত করে তাঁদের যৌনাকাঙ্খা পূরণ করা। বলা বাহুল্য ভারতীয় অধিকাংশ শাস্ত্রীয় নৃত্যকলার উৎস মন্দিরে দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গকৃত নৃত্য। একদা মন্দিরে দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত নৃত্য থেকেই বিভিন্ন ধারার নৃত্য চালু হয়েছে।

বাইজি-বারাঙ্গনারা সেই প্রাচীনকাল থেকে বিংশ শতাব্দি পর্যন্ত পুরুষদের আনন্দ সরবরাহ করার জন্যে নিজেদের ক্রমাগত বিভিন্ন কলায় প্রশিক্ষণ দান করে এসেছেন। সংস্কৃতি চর্চা ছাড়াও সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁরা, বিশেষ করে কবিতা লেখা ও কবিতা পাঠ উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য বাইরের কুলটা নারীরা যখন ক্রমান্বয়ে এমন শিক্ষিত হয়ে উঠছেন এবং পুরুষদের মনোরঞ্জন করছেণ, তাঁদের মননের চর্চার সংগী হচ্ছেন, তখন অন্তপুরে অন্তরীণ কুলবধুদের অধিকার আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে। তাঁদের কাছ থেকে বেদ-পাঠের অধিকার-ও কেড়ে নেয়া হয়। বারবনিতা-বাইজিদের অসীম অবদান আধুনিক বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য নির্মাণে।

BanglaBook.org

সংক্ষেপে বলেতে গেলে বলতে হয়, গানে, অভিনয়ে (নাটকে ও চলচ্চিত্রে) সাহিত্যের প্রতিটি ধারায় এই নারীদের বহুমুখী ভূমিকা রয়ে গেছে, যা সংক্ষেপে নিচে বর্ণিত হলো:

সংগীতঃ সংগীতে বিশেষ করে শাস্ত্রীয় সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রে বাইজি ও বারবনিতাদের অবদান অপরিসীম। নৃত্যগীতি, বাজনা তখন কুলনারীদের জন্যে একরকম নিষিদ্ধ ছিল। গানে-নাচে-বাদ্যযন্ত্রে পুরুষদের মাতোয়ারা করার দায়িত্বে ছিলেন বাইজি-গণিকারা।

প্রথম রেকর্ড আবিষ্কার ও ভারতে তার প্রচার কাহিনির সঙ্গে যে নামটি ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে সে নামটি হলো গওহরজান। দিনটা ছিল উপমহাদেশের গ্রামোফোন রেকর্ডিং ইতিহাসের তৃতীয় দিন, ১৯০২ সালের ১১ নভেম্বর মঙ্গলবার। ত্রিশ বছর বয়সী গওহরজান তিন হাজার টাকার অতি উচ্চ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বিভিন্ন ভাষায় নয়টি গান রেকর্ড করেন সেদিন। এ দিন রেকর্ডকৃত গওহরজানের একটি জনপ্রিয় গান ছিল: ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল আর এল না।

পরবর্তী সময়ে রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ও টপ্পা আঙ্গিকের এ গানটি করেছেন। গওহরজান তাঁর অর্জিত প্রচুর অর্থ-ই বিভিন্ন সামাজিক কাজে দান করেন। গ্রামোফোন রেকর্ডিং শিল্পে গওহরজান ছিলেন পৌঁছে দিয়েছিল। যে-রাগসংগীত সে সময়ের শিল্পীদের পরিবেশন করতে হত দীর্ঘ সময় ধরে, সেই পরিবেশনা মাত্র তিন মিনিটে সীমিত করে গেয়ে প্রথম রেকর্ড করেছেন গওহরজান কোনও ভাবে রাগের ধারা বা রসের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে। তাঁর এই বৈপ্লবিক সাফল্য সেই সময়ের অন্য শিল্পীদেরও প্রেরণা দেয়। অনেক শিল্পীই তখন এই ধরণের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন করে প্রতিষ্ঠা পান। উচ্চাঙ্গ সংগীতকে এভাবে গওফরজান ও অন্যান্য বাইজিরা সাধারণ মানুষের কাছে উপভোগ্য করে তোলেন।

সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে শুধু তাঁর ঈর্ষনীয় সুখ্যাতি ছিল, তাই নয়, শরীরে ককেশিয়ান রক্তধারী গওহর ছিলেন অনিন্দ্য সৌন্দর্যের অধিকারী। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন অত্যন্ত ফ্যাশনদুরস্ত নারী।

BanglaBook.org

দামী দামী গহনা ও পাথর পরতে ভালোবাসতেন। কথিত আছে, 'ঠাটে-ঠমকে চমক ছিল গওহরজানের'। এছাড়াও তখনকার সময়ের কলের গানের অন্য নামকরা গায়িকারাও সবাই ছিল গণিকাপাড়া থেকে আগত। সুকুমারী দত্ত, নটী বিনোদিনী, গওহরজান, ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া বা এদের মতো প্রাথমিক যুগের বাংলা গানের গায়িকারা সবাই ছিল বাস্তবজীবনে পেশাদার গণিকা।

তিনরকম সংগীতের ধারা ছিল গণিকা-বাইজিদের-

১. চটুল বা হাল্কা কথার গান

২. ভক্তিগীতি

৩. উচ্চাঙ্গসংগীত ও রাগরাগিনীভিত্তিক গান।

বিংশ শতকে রবীন্দ্র, নজরুল, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্র লাল রায় ও রজনীকান্তের গানে সুনাম অর্জন করেন হরিমতি, আনন্দময়ী দাস, নরসুন্দরী, বেদানাদাসী, মিস বটরাণী, মলিনা দেবী (যিনি বাইজি পেশা থেকে পরে সিনেমায় এসেছিলেন)। এঁরা সকলেই একই ধরণের পল্লীর বাসিন্দা।

অনেক সংগীতজ্ঞ মনে করেন রবীন্দ্রসংগীত জনপ্রিয় করাবার পেছনে গণিকা ও বাইজি গায়িকাদের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। শোনা যায় রবীন্দ্র সংগীতের সুর পরিবর্তন করে তারা তাঁদের মতো করে রবীন্দ্র সংগীত গাইলেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিছু মনে করতেন না। কোনো আপত্তি বা বারন ও করতেন না। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যপক ড. রবীন্দ্র গুপ্ত গণিকা-বাইজি শিল্পীদের সম্বন্ধে নিজে লিখেছেন, 'সমাজের চোখে এরা যতোই খারাপ হোক না কেন সাহিত্যে পেয়েছে তারা এক অদ্ভুত সম্মান।'

মঞ্চ নাটক আমরা সবাই জানি ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তুর দশকের আগে (১৮৭৩) মঞ্চে নারীরা অভিনয় করতে পারতেন না। পুরুষরা নারী সেজে নারীর চরিত্র রূপায়িত করতেন। নারীদের মঞ্চে অভিনয় করার যখন ডাক এলো, বারবনিতা-বাইজিরাই প্রথম এগিয়ে এলেন।

BanglaBook.org

মঞ্চে অভিনয়ে প্রথমে এগিয়ে এলেন এলোকেশী, গঙ্গামণি, জগত্তারিনী, শ্যামা, বিনোদিনী, সুকুমারি দত্ত (গোলাপসুন্দরী), তিনকড়ি দাসী, তারা সুন্দরী, দুনিয়া (পূর্ববাংলায়)। কুসুমকুমারী এসে প্রথম নাচ পরিবেশন করেন বাংলা মঞ্চ নাটকে। তারাসুন্দরী সুলতানা রাজিয়ার নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন।

কিন্তু অনেকেই যেটা জানেন না, তা হলো, ১৮৭৩ সালে নয়, ১৭৯৫ সালেই একজন বিদেশী পরিচালক বাঙালি নারীদের নিয়ে প্রথম মঞ্চ নাটক পরিবেশন করেছিলেন। গেরাসিম স্তেপানোভিচ লিয়েবেদেফ তাঁর বেঙ্গলি থিয়েটারে 'কাল্পনিক সংবদল' এর জন্যে নারী চরিত্রে মেয়েদের দিয়েই অভিনয় করিয়েছিলেন। এজন্যে তাকে গভর্নরের কাছ থেকে অনুমতিও আনতে হয়েছিল। তাঁর নাটকের জন্যে এই মেয়েদের সংগ্রহ করে এনেছিলেন গোলকনাথ দাস। কিন্তু কোথা থেকে তাঁদের জোগাড় করেছিলেন এই তথ্যটা তিনি দেন নি। খুব সম্ভবত কোন পতিতালয় থেকে নয়, তাহলে রক্ষণশীলদের হাতে তাঁর রক্ষা থাকতো না। তবে হতেও পারে, কোন দূর দূরান্তের নাম না জানা পতিতালয় থেকে গোপনে তাঁদের নিয়ে আসা হয়েছিল। তবে কারো কারো ধারণা, কোন লোকসংস্কৃতি দলের সদস্য হয়তো ছিলেন এই দুই অভিনেত্রী। সম্ভাব্য উৎস দলের তালিকায় মধ্যে থাকে গ্রামের ঝুমুর যাত্রা দল অথবা খোদ কলকাতার ঢপকীর্তনের দল।

এই ধরনের লোকসংগীতের দলের মেয়েরা তখন বেশ সাবলিলভাবেই পুরুষদের সঙ্গে গান, নাচ করে এবং কথা বলে অভ্যস্ত ছিলেন। যেখান থেকেই তারা আসুক কাল্পনিক সংবদল-এর নায়িকা সুখময় ও সহচরী ভাগ্যবতীর ভূমিকায় অভিনয় করে যাঁরা বাংলা থিয়েটারে একটা নতুন দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন, তাঁদের আর কোথাও কখনো দেখা যায়নি, তাঁদের নামও কেউ আর শোনেনি।

এরপর মঞ্চ থিয়েটারে মেয়েদের আবার স্বল্প সময়ের জন্যে আগমন ঘটেছিল ৪০ বছর পরে ১৮৩৫ সালে যখন নবীনচন্দ্র বসুর থিয়েটারে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকটি প্রদর্শিত হয়। এই নাটকে অভিনেত্রীদের নাম– রাধারাণী, জয়দুর্গা, রাজকুমারী ও বৌহরো ম্যাথরানী। এঁদের

BanglaBook.org

সকলকেই পতিতালয় থেকে নিয়ে আসা হয়েছে, জানা গেল। এতো সাবলীল তাঁদের অভিনয় যে সকলে অবাক হয়ে যায়। নবীনচন্দ্র বসুর পতিতা মেয়েদের জীবনকে আলোকিত করার এই চেষ্টার সরাসরি বিরোধিতা করে রক্ষণশীলরা।

তখনকার সাধারণ বাঙালি মানসিকতায় থিয়েটারে নারীদের কোনো স্থান নেই। অন্তঃপুরের নারীদের বাইরে এসে মঞ্চে ওঠার প্রশ্নই আসে না। আর পতিতারা এলে তাদের সংস্পর্শে ভদ্দরলোকের থিয়েটার কলুষিত হয়ে যাবে। থিয়েটার পাগল অল্পবয়সী ভালো ঘরের ছেলেদের মাথা খাওয়া হবে। ফলে নবীন বসুর থিয়েটার বেশি দিন চলল না। থিয়েটারে অভিনেত্রী নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

নবীচন্দ্রবসুর সেই উদ্যোগের ৩৮ বছর পরে, ১৮৭৩ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরৎ চন্দ্র ঘোষকে পরামর্শ দিলেন নারী চরিত্রে অভিনেত্রী গ্রহণ করার জন্যে। মাইকেলের নাটক শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) নিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হল ১৮৭৩ সালে। তখন-ই মঞ্চে এলেন এলোকেশী, জগত্তারিণী, গোলাপসুন্দরী ও শ্যামা। রক্ষণশীল সমাজ ক্ষেপে গেল। 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় নিন্দাবার্তা প্রকাশিত হল: 'সিমলার কতগুলি ভদ্রসন্তান বেঙ্গল থিয়েটার নাম দিয়া আর একটি থিয়েটার খুলিতেছে।

...যে যে স্থানে পুরুষদের মেয়ে সাজাইয়া অভিনয় করতে হয়, সেই স্থানে আসল একেবারে সত্যিকারের মেয়ে মানুষ আনিয়া নাটক করিলে অনেক টাকা হবে এই লোভে পড়িয়া তাঁহারা কতগুলি নটীর অনুসন্ধানে আছেন।

...মেয়ে নটী আনিতে গেলে মন্দ স্ত্রীলোক আনিতেই হইবে, সুতরাং তাহা হইলে শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়াইবে। কিন্তু দেশের পক্ষে তাহা নিতান্ত অনিষ্টের হেতু হইবে।'

সেকালের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিই 'মন্দ' স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে সর্বসমক্ষে ভদ্রসন্তানদের অভিনয় করা সমর্থন করেননি। বিস্ময়ের

BanglaBook.org

ব্যাপার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত এর বিরোধিতা করেন। তিনি এই বিতর্কে বেঙ্গল থিয়েটার্সের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু এবার বেঙ্গল থিয়েটার রক্ষণশীলদের ভয়ে পিছিয়ে যায়নি।

ইতোমধ্যে গণিকালয় থেকে আসা এক ঝাঁক তরুণীর নাট্য প্রতিভার গুণে মঞ্চ নাটক যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করেছে। ততদিনে সেইকালের সেরা অভিনেত্রী বিনোদিনী মাত্র বার বছর বয়সে গণিকালয় থেকে অভিনয় জগতে আসেন এবং পরবর্তি ১২ বছরে ৫০টি নাটকে অভিনয় করে দর্শকদের মাতিয়ে রাখেন। বিনোদিনীর অভিনয় ক্ষমতায় অভিভূত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায় সহ বহু জ্ঞানী-গুণীজন।

নাট্য জগতের মহারথী গিরীশ চন্দ্র ঘোষ বিনোদিনীর খুব কাছের মানুষ ছিলেন। বিনোদিনী তাঁকে গুরু ও দেবতা বলে মানতেন। স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার টাকা যোগাড় করতে বিনোদিনী জীবনের কঠিনতম স্বার্থত্যাগ করেন। নতুন থিয়েটারের নির্মানের অর্থ জোগাতে তিনি নিজ প্রেমিককে, যাকে তিনি গভীরভাবে ভালোবাসতেন (যে প্রেমিক-ও তাকে খুব-ই ভালোবাসতেন), ছেড়ে আরেকজনের একক রক্ষিতা হতে রাজি হন।

বিনোদিনী, এলোকেশী, গোলাপসুন্দরী (সুকুমারীর চরিত্রে দুর্দান্তঅভিনয় করার জন্যে পরবরর্তিকালে যিনি সুকুমারী নামেই অধিক পরিচিত হন) ও সমসাময়িক নারীর মঞ্চে অভিনয়ের দুয়ার খুলে দেন। এঁরা যখন প্রথমবারের মতো মঞ্চে অভিনয় করতে আসেন, প্রকাশ্য থিয়েটার মঞ্চে তখন অন্তপুরের নারীরা পুরুষদের সঙ্গে অভিনয় না করলেও ঠাকুর পরিবারে সেই সময় ঘরোয়া পরিবেশে, পারিবারিক আবহে নারী ও পুরুষ একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সত্তুর ও আশির দশকে জোড়াসাকোর ঠাকুরবাড়িতে ছেলে-মেয়েরা একসঙ্গে অভিনয় করেছেন, এর ভেতর রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মিকী প্রতিভা'-ও রয়েছে।

বিনোদিনীর আত্মজীবনী থেকে জানা যায় জীবনের চরমতম স্বার্থত্যাগ

BanglaBook.org

করে তিনি একটি রঙ্গমঞ্চ বানাবার অর্থ জোগাড় করেছিলেন। সন্দেহ ছিল ওই মঞ্চ আর নামে হবে। কিন্তু সব যখন হলো অতি বেদনার সঙ্গে বনোদিনী দেখলেন থিয়েটারের নাম হয়েছে স্টার থিয়েটার। বিনোদিনী বুঝলেন যত বড় অভিনেত্রীই হন না কেন এইসব ভদ্রলোকদের কাছে তিনি একজন 'পতিতা' বই অন্য কিছু নয়। এক-ই ধরনের মন্তব্য করে গেছেন সুগায়িকা মানদা দেবী তাঁর আত্মজীবনীতে।

চলচ্চিত্র ঢাকার সর্বপ্রথম চলচ্চিত্র (মূক) 'দ্য লাষ্ট কিস' এর নায়িকা ছিলেন লোলিতা। তাকে বাদামতলীর নিষিদ্ধ পল্লী থেকে নিয়ে আসা হয়। তার আসল নাম ছিল বুড়ী। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর। ছবির কাজ শেষে বুড়ী আবার পুরানো পেশায় ফিরে যান। এর বেশি কিছু লোলিতার সম্বন্ধে জানা যায় না। দ্যা লাষ্ট কিসের সহ নায়িকা চারুবালাকে আনা হয় কুমারটুলী পতিতালয় থেকে।

জিন্দাবাহার লেন থেকে আনা হয় তখনকার দিনের ঢাকার সবচেয়ে খ্যাতিমান বাইজি দেবী বাইজি বা দেববালাকে। হরিমতি বাইজিও এই চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। তিনি এসেছিলেন কলকাতা থেকে। সিনেমায় তাদের অভিনয় করানোর জন্য অনেক পত্র পত্রিকায় জোর প্রতিবাদ জানানো হয়। এঁরা সকলেই এই চলচ্চিত্রে ওভিনয় শেষে আবার নিজেদের মূল পেশায় ফিরে যান।

পরবর্তিকালে কাননবালা বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে আবির্ভূত হন এক কিংবদন্তিসম নায়িকা হিসেবে। বারবনিতার কন্যা এবং সেখানেই বড় হওয়া, এঁদের-ই একজন কাননবালা তাঁর অপরূপ রূপ, আশ্চর্য অভিনয়ক্ষমতা ও সংগীতে সমান পারদর্শীতা নিয়ে মঞ্চ নাটকে অভিনয় শুরু করলেও সবাক চলচ্চিত্রে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। পরবর্তিকালে (পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে) এক সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আগত অপরূপা সুন্দরী ও অদ্বিতীয় অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন ব্যতিত বাংলা চলচ্চিত্রের জগতে আজ পর্যন্ত কানন বালার চেয়ে জনপ্রিয় নায়িকা সম্ভবত আর নেই।

BanglaBook.org

গওহরজানের খালা জদ্দন সেকালে কলকাতা ও ঢাকাসহ ভারতের সর্বত্র একজন অত্যন্ত নামকরা বাইজি বলে পরিচিত ছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। তাঁর শেষ স্বামী উত্তম চাঁদ মোহন মুসলমান হয়ে জদ্দানকে বিয়ে করেন। মোহন নিজের নাম রাখেন আবদুর রশীদ। বিয়ের পর জদ্দান তাঁর বাইজি পেশা ছেড়ে চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে আসেন। রশীদ আর জদ্দানের ঘরে জন্ম নেন নার্গিস। এই সেই নার্গিস ভারতের চিত্রজগতে যিনি শুধু চিরভাস্বর এক নায়িকা নন, কেবল অভিনেতা সুনীল দত্তের স্ত্রী ও আরেক অভিনেতা সঞ্জয় দত্তের মা নন, জগৎজোড়া যাঁর খ্যাতি, যিনি কিংবদন্তীসম জনপ্রিয়তা ও মর্যাদা পেয়েছেন।

ফলে দেখাই যাচ্ছে, সে যুগের এই সব বাইজিরাই মঞ্চে ও ছায়াছবিতে প্রথমে অভিনয় করতে এগিয়ে এসে শিক্ষিত নারীদের চলচ্চিত্রে আসার পথ খুলে দিয়েছিলেন। আরেকভাবে বলা যায় বাইজিদের ঘর থেকেই মেয়েরা প্রথম বেরিয়ে আসেন মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করতে।

সাহিত্য এই গুণী বারবনিতা-বাইজি নারীরা নিজেরা সাহিত্য অনুরাগী ছিলেন শুধু তাই নয়, তারা ঊনিশ শতকের এবং বিংশ শতকের বড় বড় সব লেখক, কবি, নাট্যকারদের সাহিত্য রচনায় অনুপ্রাণিত করেছেন ও উৎসাহ যুগিয়েছেন। সুকুমারী দত্ত নিজে নাটক লিখেছেন। তিনি-ই প্রথম নারী নাট্যকার, নাটকের নাম 'অপূর্বসতী'। ১৮৭৫ সালে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার এটা মঞ্চস্থ করে প্রশংসা পেয়েছে। প্রখ্যাত অভিনেত্রী বিনোদিনী নাটক ও সংগীত পরিবেশন ছাড়াও 'আমার কথা' বলে আত্মজীবনী ও 'কনক' এবং 'বাসনা' বলে দু'টি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশ করেন।

শাস্ত্রীয় সংগীতে ও নৃত্যে পারদর্শীতার জন্যে অনেক লেখক শিল্পী এসে ভিড় করতেন বিখ্যাত বাইজিদের দরজায়। তাঁরা তাঁদের গান, নাচ, বাদ্যযন্ত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। ঠাকুর বাড়ির বেশ কয়েকজন পুরুষের সঙ্গে এই জগতের খ্যাতনামা কয়েকজন বাইজি-বারবনিতার বিশেষ সখ্যতা ছিল।

BanglaBook.org

বিংশ শতাব্দীর কবি-সাহিত্যিকদের রচনায়, গল্প-উপন্যাস-কবিতায়, মঞ্চস্থ নাটকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বারবনিতা-বাইজি চরিত্র অথবা এই সমাজ বা সংস্কৃতির খন্ডাংশ। ঘুরে ফিরে এই সব নারী চরিত্রগুলো খুব সহমর্মিতার সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছে সাহিত্যে।

গৃহবধূ ও বারবনিতা যুক্তভাবে ঘরে-বাইরে পুরুষের মন জুগিয়ে একটি পূর্ণ নারীর আস্বাদ দিতে সমর্থ হতো। গণিকা-কন্যারা এসেছে সমাজে নির্যাতিতা অথবা মানব দরদী হিসেবে। তাঁদের প্রতি কটাক্ষ অথবা ঘৃণা কম-ই দেখা গিয়েছে।

বারবনিতা-বাইজিদের চরিত্রগুলো সাধারণত অতি দরদ ও মমতা দিয়ে উপস্থাপন করতেন এই আধুনিক মনস্ক লেখকেরা। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'বাসবদত্তা' কবিতা, 'মানভঞ্জন' গল্প (১৮৯৬), শেকসপিয়ার-এর 'কমেডি অভ এররস্' অবলম্বনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লেখা 'ভ্রান্তিবিলাস', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ', দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'পরপারে' (১৯১২) নাটক, শরৎচন্দ্রের দেবদাস, রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, 'আঁধারে আলো' (১৯১৫), শুভদা (১৯৩৮), সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬)-এর 'পিয়ারী' উপন্যাস, রিজিয়া রহমানের উপন্যাস 'রক্তের অক্ষর', আল মাহমুদের উপন্যাস, জলবেশ্যা, মঈনুল এহসান সাবেরের 'দুই বোন', হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস 'মধ্যাহ্ন' আরো কত কী।

একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়টিকে গুরু পাপ জ্ঞানে এর থেকে পরিত্রানে কেবল প্রায়শ্চিত্যের কথাই ভেবেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫)এ গণিকা চরিত্র রয়েছে। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম বারাঙ্গনা কন্যাদের প্রতি সহমর্মিতায় 'বারাঙ্গনা' কবিতাটি লিখেছেন যা সাম্যবাদী' কবিতাগ্রন্থে (১৯২৫) অন্তর্ভুক্ত। কবি লিখেছেন, 'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও-গায়ে?' তিনি আরো লিখেছেন, অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয় বা অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয়।'

BanglaBook.org

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাইজি-বারবনিতার অবদান আজ আর অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। বাংলা গান, নাচ, নাটক ও সিনেমার প্রাথমিক রূপ দিয়েছিল কলকাতা ও ঢাকার বারোবণিতারাই। তারাই ছিলেন বর্তমানে প্রচলিত বাংলা গান, থিয়েটার ও সিনেমাশিল্পের জন্মদাত্রী, শাস্ত্রীয় সংগীত কে (সম্ভবত রবীন্দ্রসংগীতকেও) সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার বড় বাহন। ফলে দেখা যায় সংগীতে, নাচে, মঞ্চ বা চলচ্চিত্রে অভিনয়ে, সাহিত্য রচনায় আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকেই নারীরা রয়েছে সক্রিয়, পুরুষের পাশাপাশি।

পুরুষ তাঁর পিতৃত্বের পবিত্রতায় সংশয়হীন হতে এবং স্ত্রীর একগামিতা (সতীত্ব) রক্ষার্থে স্ত্রীকে ঘরবন্দী করেছে কুলনারী হিসেবে। সেই সাথে নিজের বিনোদন ও মননের চর্চা করতে ঘরের বাইরে রেখেছে আরেক ধরণের নারী–মন্দ নারী-কুলটা বা বারবনিতা কিংবা বাইজি বলে যারা সমাজে পরিচিত। রাত্রির অন্ধকারটুকু ছাড়া এই অর্থবান পুরুষেরা পড়ে থাকতেন বাইরের জগতে এই নারীদের দরবারেই।

শিক্ষায়- দীক্ষায়- নাচে- গানে- কবিতা- রসিকতায় এই শেষোক্ত নারীরা পুরুষের সাংস্কৃতিক মনঙ্কে, তাদের বুদ্ধিমত্তাকে উদ্দীপিত করতে সমর্থ ছিল। ফলে তাঁদের সঙ্গ-কামনায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন পুরুষকুল। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পুরুষ ও পুরুষতন্ত্রের সাজানো এই সামাজিক বিভাজনের কাঠামোতে পুরুষ-সম্রাট নির্বিচারে ভোগ করছিলেন অবাধ সুখ ঘরে-বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই।
পুরুষের খেলার পুতুল নারীও তাঁর নির্দিষ্ট গন্ডির ভেতরে থেকে তাঁর জন্যে নির্ধারিত ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছিলেন বরাবর। নিজেদের সকল বঞ্চনা, সকল বিষাদ, সকল বৈষম্যের জ্বালা ভুলে বা গোপন করে পুরুষদের অকাতরে সেবা ও আনন্দ বিতরণ করে গিয়েছেন। বিশেষ করে বাইজি মেয়েদের হাসি, গান আর আনন্দের পেছনে প্রায় সব সময়েই লুকিয়ে থাকতো অনেক ব্যক্তিগত কষ্ট, কান্না,

BanglaBook.org

বেদনা আর দীর্ঘশ্বাস। পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ প্রেম, প্রতারণা এবং ঘর-সংসার-সন্তান কামনায় হোঁচট খেতে খেতে তারা অনেকেই যে ক্রমাগত অসীম মনোযন্ত্রণার শিকার হতেন, সে খবর কেউ রাখতো না।

এদিকে ঘরে আবদ্ধ কুলনারীও কেবল স্বামীর দেহরঞ্জন করে, সন্তানের জন্ম দিয়ে আর তাঁদের প্রতিপালন করতে করতে নিজেদের মননের চর্চার অবকাশ বা সুযোগ না পেয়ে অবরুদ্ধ অবস্থায় হাঁপিয়ে পড়ছিলেন। তবু তাঁরা চেষ্টা করছিলেন তাঁদের স্ব স্ব জায়গায় থেকে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করে যেতে।

কিন্তু জগৎ জুড়ে এবং উপমহাদেশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক পালাবদল যেমন পরপর দু'টি বিশ্বযুদ্ধ, পৃথিবীর দৈশিক ও ভৌগলিক মানচিত্রের বদল, সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি ও বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মতে উত্তরণ, কমিউনিজমের উত্থাণ ও প্রভাব, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, জমিদারী-প্রথার বিলুপ্তি, নারী-স্বাধীনতা আন্দোলন, জন্মনিয়ন্ত্রণের বড়ি আবিষ্কার ইত্যাদি একের পর এক ঘটনা বা নারী-বান্ধব রীতির সংযোগ পুরুষের সেই আরামদায়ক ও নিশ্চিন্তের মজবুত আসনটিকে নড়বড়ে করে দিল একেবারে গোড়া থেকে।

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে নারীর অবদানকে যত-ই অস্বীকার করার চেষ্টা করা হোক না কেন, প্রান্তিকী পর্যায়ে আটকে পড়া নারীও তাঁর সামর্থ অনুযায়ী মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে শুরু করে। কখনো নারী নিজেই এগিয়ে যান সাহিত্য বা সংস্কৃতির কোন শাখার হাত ধরে, কখনো পুরুষের অগ্রসরকে এগিয়ে দেন নারী সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে। অন্তপুরে নিক্ষেপিত নারী আবার ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করে বেরিয়ে আসতে শুরু করেন পৃথিবীর মুক্ত আলোতে– উচ্চতর সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে। যতদিন এই তথাকথিত 'কুলনারী' বা 'সতীনারী'রা পূর্ণ বন্দি ছিলেন অন্তপুরে, বাইরে অবস্থানরত তথাকথিত 'মন্দ নারী' বা 'বারবনিতারা' সভ্যতার হাল ধরে এই অঞ্চলের সংস্কৃতি ও চিন্তাকে বদ্ধ জলাশয়ে আটকে থাকতে না দিয়ে তাদের সমৃদ্ধির জন্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন।

BanglaBook.org

বর্তমানে গৃহবধূ ও সম্ভ্রান্তঘরের নারীদের সংগীত, নৃত্য, সাহিত্য বা অভিনয়কলায় অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে আগেকার দিনের কঠিন সামাজিক বাধা অনেকটাই দূর হয়ে গেছে। ফলে গণিকালয়ের গণিকারা আজ তাদের পূর্ব মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রতিপত্তি হারিয়ে কেবল পুরুষদের দেহ ও মনোরঞ্জনের জন্যে নিজের যৌবন, চপলতা আর রূপকেই মূলধন করে নিষিদ্ধ পল্লীতে কোনোমতে জীবনধারণ করে চলেছে। আর সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়ে পারদর্শী অন্তপুরের মেয়ে এবং বধূরা আজ সগৌরবে বেরিয়ে আসছে কেবল অন্যদের মনোরঞ্জনের জন্যে নয়, সম্মানীয় পেশাদার শিল্পী হিসেবে নিজের চর্চিত ললিতকলার ঔৎকর্ষ পরিবেশনের জন্যে নিজেকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্যে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

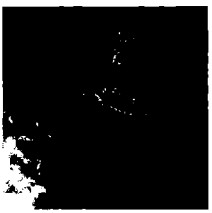

ঢাকার খেমটাওয়ালি ও বাইজিদের কথা

খন্দকার মাহমুদুল হাসান

কিংবদন্তিতুল্য কথাসাহিত্যিক সাদত হাসান মান্টো (১৯১২-১৯৫৫ খ্রি.) উপমহাদেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের অমূল্য দলিল গ্রন্থ 'গাঞ্জে ফেরেশতে'-এর 'নার্গিস' অধ্যায়ে জদ্দন বাই সম্পর্কে বিশদ তথ্য উপস্থাপন করে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি লিখেছেন, জদ্দন বাই গল্প উপন্যাস পরতে ভালোবাসতেন। আমার লেখার বেশ কদর করতেন এবং মনোযোগ দিয়ে পড়তেন। আমার সে সময়কার একটা গল্প 'সাকীতে ছাপা হয়েছিল। সম্ভবত গল্পটির নাম 'তরক্কী ইয়াপ্তা কবরে স্থান।' তিনি গল্পটি পড়ে বেশ মুগ্ধ হন।

(তথ্যসূত্র গাঞ্জে ফেরেশতে-সা'দত হাসান সান্টো; অনুবাদ-মোস্তফা হারুন; ১৯৮১ সংস্করণ; পৃষ্ঠা : ৭১)

BanglaBook.org

এই জদ্দন বাই আদতে পেশায় ছিলেন বাইজি। অবশ্য পরে মুম্বাইয়ের চিত্রজগতের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা নিবিড় হয়। আর তিনিযে-সে বাইজি নন, খুব নামকরা বাইজি এবং তার মেয়ে নার্গিস

(১৯২৯-১৯৮১ খ্রি.) সম্পর্কে অবশ্য নতুন করে বলার কিছু নেই। জনসেবা এবং রাজনীতিতে তার অনেক বড় ভূমিকা ছিল। তবে সবকিছু ছাপিয়ে উঠেছিল তাঁর অভিনেত্রী পরিচয়। বোম্বের (বর্তমান নাম মুম্বাই) চলচ্চিত্রের এ কিংবদন্তি নায়িকা নার্গিস-এর বাবা উত্তম চাঁদ মোহন ওরফে মোহনবাবু ছিলেন উঁচু তলার মানুষ। কিন্তু জদ্দন বাইয়ের ভালোবাসায় সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছিলেন তিনি। স্ত্রী জদ্দন বাইয়ের প্রতি তাঁর অনুরাগের বর্ণনাও কম পাওয়া যায়নি। তিনি ধর্ম পর্যন্ত পরিবর্তন করে আবদুর রশিদ নাম ধারণ করেছিলেন।

ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভার সদস্য মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সে বিয়ের স্বাক্ষী ছিলেন। জিদ্দন বাই নিজেও দলিপা নামের বাইজির সন্তান। জদ্দন বা জদ্দন বাই ঢাকার বাইজিদের মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত জীবনকালে তিনি ঢাকায় আসর মাতিয়েছেন অনেক। তাঁকে 'ঢাকার বিভিন্ন নাচ-গানের আসরে মধ্যমণি' বলে উল্লেখ করেছেন অনুপম হায়াৎ 'সেকালের ঢাকার বাঈজী' শীর্ষক প্রবন্ধে।

সত্যেন সেন 'শহরের ইতিকথা'য় লিখেছেন, 'কলকাতা ও ভারতের উত্তরাঞ্চল থেকে যে সমস্ত বাইজি বায়না নিয়ে এখানে মুজরা করতে আসতেন, তাঁদের মধ্যে এই নামগুলো উল্লেখযোগ্য: গহরজান, নুরজাহান, মালকাজান, সিদ্ধেশ্বরী, জানকী বাই (ছাপান্ন ছুরি), জরদান বাই (সিনেমার নার্গিসের মা), কোহিনূর, ইন্দুবালা।'

(তথ্যসূত্র শহরের ইতিকথা-সত্যেন সেন, ২০০৬ সংস্করণ, ৬৩ পৃষ্ঠা)।

বাইজিরা মধ্যযুগে প্রাচ্যের উচ্চবিত্ত শ্রেণির চিত্তবিনোদনের অপরিহার্য অনুসঙ্গ বলে বিবেচিত হতো। ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের সময়কাল থেকে (১৬১০ খ্রি.) এখানে বাইজিদের আগমনের তথ্য পাওয়া যায়। 'কাঞ্চনী' নামে যাদের তথ্য পাওয়া যায় তারা নাচ-গান করতেন। দরবারি নৃত্যশিল্পীরা যে মুঘল সুবাদারদের দরবারে কদর

BanglaBook.org

পেতেন তাতে ভুল নেই। অবশ্য মুঘল রাজধানী হওয়ার আগে থেকেই ঢাকায় জনবসতি ছিল এবং তখনও যে সেখানে বাইজিরা ছিল না তা কে বলবে। কাঞ্চনী কথাটা কোথা থেকে এল এবং কী তার ব্যাখ্যা সে এক জরুরি প্রশ্ন বটে। এই প্রশ্নের একটা জবাব দিতে সচেষ্ট হয়েছেন হাশেম সূফী। তিনি 'ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে' গ্রন্থের তাঁর অনূদিত ১৯৯৫ সংস্করণের ১১৬ পৃষ্ঠার ১নং টীকায় উল্লেখ করেছেন,কাঞ্চনী বা কাঞ্চালিয়া শব্দটি সম্ভবত এসেছে কান-সিয়াস-সু-লু-নাল নামক তৎকালীন চৈনিক শব্দ থাকে, অর্থাৎ যে মহিলাদের পেশা নাচগান তাদেরকে বলা হয় কাঞ্চনী।

ইসলাম খানের ঢাকা আগমনের পূর্বে অবশ্যই ঢাকা তুর্ক আফগান পাঠানদের সমৃদ্ধশালী একটি নগরী ছিল। ঢাকা অঞ্চলের তৎকালীন অর্থাৎ প্রায় ৬০০ বছর পূর্বের নাচগান সম্পর্কে ইবনে বতুতা ছাড়াও চৈনিক পরিব্রাজন মাহুয়ানও বলে গেছেন। 'মাসিরুল উমরা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে ইসলাম খান সরকারিভাবে ১২০০ কাঞ্চনীর জন্য তৎকালীন ৮০,০০০ টাকা খরচ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে হাকিম হাবিবুর রহমানের মন্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন, ম. শার্লিম্যান তার রচিত 'বাংলার ইতিহাসে' লিখেছেন যে ইসলাম খানের দরবারে ১২০০ কাঞ্চনী ও সেবিকা ছিল যাদের পেশাই ছিল নাচগান। এটা থেকে মনে হয় ইসলাম খানের ঢাকায় আগমনের পূর্বেও ঢাকা ভালোভাবেই জন অধ্যুষিত ছিল। আর এখানে গান বাজনার চর্চাও ছিল। তা নাহলে হঠাৎ এত কম সময়ে ১২০০ কাঞ্চনী কোথা থেকে আসল, ইবনে বতুতা থেকেও এ ব্যাপারে সত্যতা পাওয়া যায়। তিনি বর্ণনা করেছেন যে বাংলায় এত সুলভে পরিচারিকা পাওয়া যেত যারা ফার্সি গজল ভালো গাইতে পারতেন।'

(তথ্যসূত্র ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে, হাকিম হাবিবুর রহমান; অনুবাদ–হাশেম সূফী; ১৯৯৫, পৃ. ১১১)।

ঢাকার সঙ্গীত ঐতিহ্য অনেক পুরনো এবং এ শহরে সংগীত, নৃত্য ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারেরও দীর্ঘ অতীত আছে। এ শহরে

BanglaBook.org

সঙ্গীতের যেমন অনেক সমঝদার ছিলেন, তেমনি পেশাদার সংগীত সাধক ও সংগীত পরিবেশকও ছিলেন। মুঘল যুগের আগে থেকে তা থাকলেও মুঘলযুগে ঢাকায় গান-বাজনা ও নৃত্যকলার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অনেক বেশি জোরদার হয়েছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংরা একাডেমির ব্যবহারিক বাংলা অভিধান অনুযায়ী বাইজি অর্থ-'পেশাদার সম্ভ্রান্ত বা উচ্চশ্রেণির নতর্কী।' একই অভিধান অনুযায়ী 'বাই' অর্থ' সাম্ভ্রান্ত মহিলার নামের শেষে সম্মানসূচক শব্দ–মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজপুতনা প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহৃত।' এছাড়াও পেশাদার গায়িকা ও নতর্কী অর্থেও শব্দটির ব্যবহার আছে। অবশ্য যে নাম বা পরিচয়েই পরিচিত হোক না কেন নর্তকী গায়িকাদের প্রভাব দিল্লির মুঘল দরবারের মতো ঢাকার সুবাদারদের দরবারেও ছিল। তবে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হওয়ার পরও ঢাকার দরবারি নাচ-গানের চল ছিল।

মুর্শিদকুলি খান বাংলার সুবাদার অর্থাৎ গভর্নর ঢাকায় উপ-গভর্নের দফতর স্থাপিত হয় এবং ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দেই ঢাকায় খান মোহাম্মদ আলি খান ঢাকার উপ-গভর্নর বা নায়েব নাজিম নিযুক্ত হন। একসময় নায়েব নাজিমরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন এবং কোম্পানি যুগে উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেই তাদের মর্যাদাহানি চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে আসে এবং স্রেফ ভাতাভোগী পরিবার প্রধান হিসেবে তারা কোনো রকমে টিকে থাকেন। শেষাবধি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে গাজি উদ্দিন হায়দার-এর জীবনাবসানের মাধ্যমে ঢাকায় নায়েব নাজিম যুগেরও অবসান ঘটে।

এই নায়েব নাজিমদের প্রাসাদে নাচ-গানের আসর বসত। আবার শেষ পর্যায়ের নায়েব নাজিমদের কারো কারো বাঈজি প্রীতি মারাত্মক ছিল। অবশ্য সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। নায়েব নাজিমদেরকেও নবাব পরিচয়ে পরিচিত করা হতো। এরা ঢাকার প্রথম পর্যায়ের নবাব। তবে নবাব একটা উপাধি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের এই উপাধিধারীরা উনবিংশ শতক থেকে বংশানুক্রমে বিংশ শতকের

BanglaBook.org

প্রথমার্ধ পর্যন্ত উপাধিটি ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের নবাবরা বাস করতেন আহসান মঞ্জিলে। প্রথম পর্যায়ের নবাবরা বাস করতেন নিমতলী প্রাসাদে। এই দুটি প্রাসাদেই বাইজিদের আগমন ঘটত। তাই ঢাকার বাইজিদের অনুষ্ঠান আয়োজনের স্মৃতিময় গুরুত্বপূর্ণ দুটি স্থানের একটি হলো আহসান মঞ্জিল ও অন্যটি নিমতলী প্রাসাদ।

আহসান মঞ্জিল এখন জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত হলেও নিমতলী প্রাসাদটি ধ্বংস হয়ে গেছে, শুধু এর একটি তোরণ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর ভেতরে এখনও কোনো রকমে টিকে আছে।

ঢাকার বাইজিদের প্রসঙ্গ এলেই খেমটা নাচের প্রসঙ্গও আসে। সত্যেন সেন 'শহরের ইতিকথা' গ্রন্থের (২০০৬ সংস্করণের) ৬১ থেকে ৬৭ পৃষ্ঠায় 'ঢাকা শহরের নাচ-গান' শীর্ষক অধ্যায়ে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের খুঁটিনাটি বিষয় আলোচিত হয়েছে।

সেই আলোচনা বিশ্লেষণ করে এই দুয়ের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা এরকম :

ক্রমি নং	খেমটাওয়ালি	বাইজি
১.	হালকা তাল 'খেমটা' থেকে সৃষ্ট নাম। খেমটা দলের নাচ ও গানের বিষয় গুরুগম্ভীর ছিল না, বরং তা ছিল কামোদ্দীপক ও চটুল।	বাইজিরাও নাচ-গান করত। তবে তা ছিল শিল্পসম্মত ও মর্যাদাসম্পন্ন।
২.	খেমটা দল ২ জনের নিচে হওয়া সম্ভব ছিল না ।	বাইজিরা এককভাবে নাচ-গান করত।
৩.	অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২, ৩ বা ৪ জোড়া হিসেবে খেমটার বায়না দেওয়া হতো।	একেকজন বাইজিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান হতো। বিশেষ বাইজি সেই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি হতো।

ক্রমি নং	খেমটাওয়ালি	বাইজি
৪.	খেমটা দলগুলোতে বিশেষ পেশাজীবী ছিল। তাদের নাম 'সফরদার'। এদের কেউ নর্তকীদেরকে নাচ-গান শেখাত, কেউ দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো, আবার প্রধান কাজ ছিল বাজনা বাজানো।	সফরদারের মতো ভূমিকা পালনকারী লোকেরা বাইজিদের নাচ-গানে সহায়ক ছিল। তাদের বিশেষ পোশাকের মধ্যে ছিল ভেলভেটের কিস্তি টুপি, ওয়েস্ট কোট, পাঞ্জাবি।
৫.	কলকাতায় খেমটা নাচের উদ্ভব হওয়ার কথা অনুমান করা হয় এবং সেখান থেকে তো ঢাকায় আসে।	যখন কলকাতা নামের কোনো জনপদের সৃষ্টির সম্ভাবনাই দেখা দেয়নি, তখনও মুঘল রাজধানী ঢাকায় বাইজিদের অস্তিত্ব ছিল।
৬.	খেমটা নাচের ও গানের উৎপত্তি ঝুমুর নাচ ও হাফ আখড়াই গান থেকে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।	উত্তর প্রদেশের উচ্চাঙ্গ ও মানসম্পন্ন সঙ্গীতের সাথে বাইজিদের ভালো পরিচয় ছিল।
৭.	কম করে ২০/২২ জোড়া খেমটাওয়ালি ঢাকায়।	বাইজিরা অপেক্ষাকৃত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিল।
৮.	খেমটারা অপেক্ষাকৃত কম সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিল।	বাইজিরা অপেক্ষাকৃত উচ্চ পর্যাদার অধিকারী ছিল।
৯.	খেমটা থেকে বাইজিতে পরিণত হলে তাকে মানোন্নয়ন বলে ধরা হতো। যেমন দেবী, সীতা ও গোবিন্দরানী খেমটা থেকে বাইজি হয়েছিলেন।	বাইজিরা খেমটার দলে যেত না।

ক্রমি নং	খেমটাওয়ালি	বাইজি
১০.	খেমটার দলে ২টি হারমোনিয়াম বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকত। তবে সাধারণ মন্দিরা, সারেঙ্গি তবলা, বেহালা ও ক্ল্যারিওনেট ব্যবহৃত হতো।	প্রচলিত মন্দিরা, সারেঙ্গি ও তবলার চেয়ে আকারে বড় বেনারসী মন্দিরা, সারেঙ্গি ও তবলার মতো বাদ্যযন্ত্রও ব্যবহৃত হতো।
১১.	খেমটাদের পারিশ্রমিক ছিল কম। ঢাকার খেমটাদের জন্য ৩৫ থেকে ৭০ টাকা, আর কলকাতার খেমটাদের ২০০ থেকে ৪০০ টাকা পারিশ্রমিক ছিল।	বাইজিদের পারিশ্রমিক ছিল অনেক বেশি। বাইরে থেকে আসা বাইজিদেরকে ৫০০ থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত দৈনিক পারিশ্রমিক ছাড়াও বাদ্যযন্ত্রী এবং হুকুম বরদারদের থাকা খাওয়া ও যাতায়াত ভাড়াও গুনতে হতো।
১২.	প্রশিক্ষণ দিত সফরদাররা।	প্রশিক্ষণ দিত মুসলিম ও বসাক ওস্তাদরা।
১৩.	খেমটাওয়ালিরা পায়ে বড় ঘুঙুর পরত।	বাইজিরা চুড়িদার পাজামা, ওড়না, পেশওয়াজ ও পায়ে চিকন ঘুঙুর পরত।
১৪.	গানের ভাষা প্রধানত বাংলা।	প্রশিক্ষণ দিত মুসলিম ও বসাক ওস্তাদরা।
১৫.	খেমটা নাচের প্রধান দিক ছিল পায়ের কাজ।	বাইজিদের নাচের প্রধান দিক ছিল চোখ, নাক, ঠোঁট ও মুখের শিল্পসম্মত কম্পন ও ব্যবহার এবং হাতের ভঙ্গি।

ক্রমি নং	খেমটাওয়ালি	বাইজি
	ঢাকার বিখ্যাত খেমটাওয়ালিদের মধ্যে কয়েকজন ভুবনেশ্বরী, হরিমতি, প্রিয়া, সরফু, মিলন, প্রমদান, পারুল, নাটকী, বীনা, ছুটকী, ষোড়শী, মলিনা, চারু প্রমুখ।	ঢাকার বিখ্যাত বাইজিদের মধ্যে ছিলেন: মালকাজান, মুম্বাইয়ের সুপারহিট নায়িকা নার্গিসের মা জদ্দন বাই, নূরজাহান, গহরজান, ইন্দুবালা, কোহিনূর, জানকী বাই, সিদ্ধেশ্বরী, সীতা প্রমুখ।

এবং প্রায় মগডালেই অবস্থান করত। তাদের রূপগুণের চর্চা একেবারে সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছিল, তবে তা দূর থেকে দেখা ও শোনার পর্যায়ে। তাদের বড্ড কৌতূহল ছিল বড় বড় ও নামকরা বাইজিদের সম্পর্কে। বলা চলে প্রবল কৌতূহল ছিল।

পরবর্তীতে চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠলে এই কৌতূহলকে প্রতিস্থাপিত করেছিল চিত্রতারকাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহে। অবশ্য সাধারণ মানুষ চিত্রতারকাদেরকে প্রায় কখনই দেখতে পেত না। তবে ঢাকার বাইজিদেরকে কখনও না কখনও, কেউ না কেউ চোখে দেখতে পেত।

ঢাকার খেমটা ও বাইজি নাচের সাথে হাকিম হাবিবুর রহমান-এর (১৮৮১-১৯৪৭) পরিচয় ছিল। প্রত্যদক্ষদর্শী হিসেবে তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে'-তে অনেক তথ্যসহ এ প্রসঙ্গে বর্ণনা দিয়েছেন। খেমটা এবং খেমটাওয়ালিদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন, খেমটা বাংলার বিখ্যাত নাচ যা একা নাচা যায় না, জোড় বেঁদে নাচতে হয়। নিঃসন্দেহে এই নাচ ভিন্নতর। আর অনেকটা কবুতরের নৃত্যের সাথে সাদৃশ্যমূলক। এরা অধিকাংশই বাংলা গান করে আর কখনও হিন্দি ঠুমরীও গায়। তাদের মধ্যে যদি কেউ উন্নতি করতে পারত তাহলে সে তাওয়ায়েফ

BanglaBook.org

হওয়ার জন্য পদোন্নতি পেত। আর তাই সেভাবেই দূর-আখের খুকি নামের একজন হিন্দু বাইজি এই গোত্র থেকে তাওয়ায়েফ হয়েছিল।'

(তথ্যসূত্র ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে-হাকিম হাবিবুর রহমান। অনুবাদ : হাশেম সুফী ১৯৯৫। পৃ. ১২৯)।

ঢাকায় কয়েকজন বাইজির পরিচয় দিয়ে একই গ্রন্থের ১২৮ ও ১২৯ পৃষ্ঠায় হাকিম হাবিবুর রহমান বলেছেন, আন্নু, গান্নু, নওয়াবীন এর তিন বোন ছিল। নওয়াবীন অনেক নাম করেছিল...এই মাত্র কিছুদিন হলো বুড়ি হয়ে মারা গেছে। এই তিনজনই বাড়ি ও বাগান সবকিছুই করেছিল। তাদের আত্মীয়-স্বজনরা এখনও আছে। এলাহীজান এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। আবেদী সম্ভবত পাটনার ছিল, তার এক মেয়ে এখনও জীবিত আছে। পেয়ারী বেগম সাহেবা নিঃসন্তান ও বসন্তশূন্য বার্ধক্যে উপনীত ছিল। আচ্ছী বেগম সাহেবা মূলত লাখনৌবাসী ছিলেন। আর নৃত্য প্রদর্শনে নৈপুণ্যতা দেখাতেন।

ঢাকায় এত বড় নর্তকী তাওয়ায়েফর পরবর্তীতে আর আসেননি। প্রায় ৩০ বছর হলো প্রাণত্যাগ করেছেন। ওয়াসু আসলে ধারান জাতীয় গায়িকা ছিল। বাতানী ভালো ছিল যে, নিজ পেশা ছেড়ে বাইজি হয়ে গিয়েছিল। তবে মেয়ে জামরাবাদ যে মৃগী রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ওস্তাদী গান গাইত। আমি তার গান অবুঝকালে শুনেছিলাম। হীরার নৃত্য তার বার্ধক্যে দেখেছিলাম। সে কৃষ্ণবর্ণের নারী ছিল। কিন্তু তার মেয়ে পান্না গজল গেয়ে অনেক নাম করেছিল। ইমামী নামে একজন ছিল যার উৎকর্ষতা ছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে আর ভালো ছিল নাচেও।

ইমামী ইউপি'র বাসিন্দা ছিল। সেই একমাত্র শিল্পী যে জীবিতকালেই ঢাকা থেকে বিদায় গ্রহণ করেছিল। তা ছাড়া বাকি সবাই এখানে মাটির নিচে সমাহিত হয়েছিল। আমিরাজানও একজন বিখ্যাত নর্তকী ও গায়িকা ছিল। তাকে ছাড়াও শহরে কিছু হিন্দু তাওয়ায়েফ ছিল যাদের মধ্যে অতুল বাঈ, লক্ষ্মীবাদ, কালীবাঈ ও

BanglaBook.org

রাজলক্ষ্মী নামকরা ছিল। রাজলক্ষ্মীর একটি স্মৃতি হলো ইসলামপুরের জিন্দাবাহার গলির মোড়ের কালীমন্দির যা বড় ভূমিকম্পে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেই সেটাকে পুনঃনির্মাণ করে দিয়েছিল।

বাইজিদের দেখা ও তাদের গান শোনার আগ্রহ উনবিংশ শতকের ঢাকাবাসীর মধ্যে কত প্রবল ছিল তা হাকিম হাবিবুর রহমান এর বর্ণনা পড়লে বোঝা যায়। ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণকারী হাকিম হাবিবুর রহমান এমন একটি বিশেষ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জানিয়েছেন, 'তখন আমার বয়স ছয়-সাত বছরের বেশি ছিল না।' তার অর্থ সেটি ছিল বড়জোর (১৮৮১+৭) ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।

তাওয়ায়েফ (অর্থাৎ গায়িকা-নর্তকী) এলাহীজান-এর নাচের আকর্ষণে জড়ো হওয়া লোকজনের মধ্যে দুর্ঘটনায় পড়ে কয়েকজনের প্রাণহানীর বিবরণ দিয়েছেন তিনি। সেই বিবরণ হুবহু শোনা যাক। তাঁর সেই বর্ণনা এরকম, শাহবাগের গোলতালাও যার মাঝখানে একটি বিস্তৃত পাকা চত্বর আছে যেখানে লোকেরা লোহার সাঁকা দিয়ে পৌঁছতেন। সেই চত্বরে এলাহীজান নামের একজন তাওয়ায়েফ তখন নৃত্য প্রদর্শন করছিল। তার সঙ্গী-সাথী ছাড়া আরও পনেরো-বিশ জনের মতো সেখানে ছিল। তালাও বা পুকুরের চতুর্দিকে দর্শকবৃন্দের প্রচুর ভিড় ছিল এবং অনেক লোক সেই সাঁকোর উপরে ছিল যাতে কোনোভাবে নৈকট্য অর্জন করতে পারে। যেই অকস্মাৎ সাঁকো ভেঙে পড়ল আর সমস্ত লোক পুকুরে পড়ে গেল। সেই পুকুরের পূর্বদিকে যেখানে নুরুদ্দিন হোসেনের মাজার আছে সেখানে নিজেদের কাজের লোকের সাথে আমি বসে ছিলাম। আমার চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটে গেল।

প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি প্রাণ বিনষ্ট হলো। আর বেচারী এলাহীজানকে অনেক কষ্টে বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে নৌকায় উঠানো হলো এবং আমার তো এখনও এলাহীজানের আরোহণ ও অবতরণ এর

BanglaBook.org

সময় হায়-হুতাশ করা, ক্রন্দন ও আর্তনাদ করার কথা মনে আছে।

(তথ্যসূত্র ঢাকা পাচাস বারাস পাহলে–হামিক হাবিবুর রহমান, অনুবাদ-হাশেম সূফী; ১৯৯৫ পৃষ্ঠা ১২১,১২২)।

বাংলাদেশের সমাজ বাস্তবতায় খেমটাওয়ালিদের উঁচু মর্যাদা দেওয়া হতো না। তবে তার মানে এ নয় যে তারা ঘৃণিত ছিল। কঠোর ধর্মানুসারী রক্ষণশীল সমাজে তারা যে কিছুটা অপাংক্তেয় ছিল তা অনুমান করা যায়। তবে বাইজিরা সমাজের এত উঁচু স্তরের সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ছিল যে, তারা সাধারণের নাগালের চেয়ে অনেক উঁচুতে হাকিম হাবিবুর রহমান-এর বর্ণনা থেকে আমরা উল্লেখযোগ্য যেসব বাইজি, গায়িকা ও তবলা বাদকের নাম পাই তারা ছিলেন–

১. আন্নু (উত্তর ভারত থেকে আগত)
২. গান্নু (উত্তর ভারত থেকে আগত)
৩. নওয়াবিন (উত্তর ভারত থেকে আগত)
৪. এলাহীজান (উত্তর ভারত থেকে আগত)
৫. পেয়ারি বেগম
৬. ওয়াসু (পাটনার পাশাপাশি এলাকা থেকে আগত)
৭. আবেদি (পাটনা থেকে আগত)
৮. আচ্ছি বেগম (লক্ষ্মনৌ থেকে আগত)
৯. বাতানি
১০. জামারারাদ
১১. হীরা
১২. পান্না
১৩. ইমামী (ইউপি থেকে আগত)
১৪. আমিরজান
১৫. অতুল বাই
১৬. লক্ষ্মী বাই
১৭. কালী বাই
১৮. রাজলক্ষ্মী
১৯. আখের খুকি (আদতে খেমটাওয়ালি, পরে বাইজি)
২০. সুপনজান

সত্যেন সেন, সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর, সোমনাথ চক্রবর্তী, অজয়সিংহ রায়, অনুপম হায়াৎ ও সাব্বির আহমদ এর বিবরণ থেকে ঢাকার যেসব বাইজির নাম পাওয়া যায় তাদের মধ্যে দেবী ও হরিমতি ঢাকার নির্বাক যুগের প্রথম পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র 'দ্য লাস্ট কিস' (১৯৩১ খ্রি.)-এ অভিনয় করে এ দেশের চলচ্চিত্র ইতিহাসের স্থায়ী অংশ হয়ে আছেন। তাদের সম্পর্কে অনেক তথ্য উদঘাটন করে অনুপম হায়াৎ 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস' গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

যাহোক হাকিম হাবিবুর রহমান ছাড়া অন্যদের রচনা থেকে প্রাপ্ত বাইজিদের নামের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম :

১. আচ্ছন বাই
২. মুশতারি বাই
৩. জানকী বাই বা ছাপ্পান্ন ছুরি
৪. মালকাজান
৫. জদ্দন বাই
৬. গহরজান
৭. হরিমতি
৮. দেববালা বা দেবী
৯. কুসুমা
১০. সরোজিনী
১১. কোহিনূর
১২. সীতা
১৩. চারুবালা
১৪. কনক
১৫. ইন্দুবালা

তবে এদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষভাবে আলোচিত। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় এলাহাবাদ থেকে আগত জানকীবাই এর কথা। সাধারণ্যে তিনি ছাপ্পান ছুরি নামেও পরিচিত পেয়েছেন। সত্যেন সেন 'শহরের ইতিকথা'য় (২০০৬ সংস্কারণের ৬৫ পৃষ্ঠায়)

উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ছিলেন ঢাকার এক নবাবের রক্ষিতা। তাঁর পারিশ্রমিক ছিল সর্বাধিক এবং প্রতিদিন ১৫০০ টাকা করে। তিনি যাতে অন্য কারও নজরে না পড়ে যান সেজন্য ওই নবাব তার দেহে ছুরির আঘাতে ৫৬ টি ক্ষতের সৃষ্টি করেন বলে কথিত এবং এ কারণে তার নাম ছাপ্পান ছুরি হয়েছে বলে প্রত্যদক্ষর্শীর সাথে কথা বলে লিখেছেন সত্যেন সেন।

উপরোল্লেখিত গ্রন্থে সত্যেন সেন ইন্দুবালা সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, ইন্দু বালাই প্রথম প্রথা ভেঙে বাংলা গান করেন এবং প্রধানত কাজী নজরুল ইসলামের গান করেন। এর আগে বাইজিরা সবাই হিন্দি বা উর্দু গানই করতেন। বাইজির আসরে তিনি গান গাইলেও নাচতেন না বলেও সত্যেন সেন-এর বর্ণনায় দেখা যায়। সুকণ্ঠী ইন্দুবালা আজও উচ্চাঙ্গ সংগীত চর্চায় একটি স্মরণীয় নাম।

আর একজন বাঙালি বাইজির পরিচয় পাওয়া যায় সত্যেন সেন-এর বর্ণনায়। তিনি কোহিনূর। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী তিনি হিন্দি ও উর্দু গান গাইতেন। এছাড়াও তিনি বাংলা সুরে ইংরেজি গান গাওয়ার রীতি চালু করেছিলেন। জন্ম পরিচয়ের বিবেচনায় তিনি বাঙালি জনসমাজে জনমদুঃখী ছিলেন, কারণ কলকাতার লাহা পরিবারে সুন্দরী এক বিধবার অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান ছিলেন তিনি। পিতৃপরিচয়হীন এই মেয়েটি মাতৃস্নেহে থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। বাইজির পেশা তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থাও করেছিল। এটর্নি সুরেন ঘোষ তাঁকে রক্ষিতা হিসেবে রেখেছিলেন। এই সুরেন ঘোষের বাবা ছিলেন বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ। শুধু কোহিনূর নন, আরও অনেকেই বাধ্য হয়ে খেমটাওয়ালি বা বাইজি হয়েছিলেন। সীতা, ষোড়শী ও ভূবনেশ্বরী নামের খেমটাওয়ালি এবং সরোজিনীর বাইজি হওয়ার পেছনের করুণ কাহিনি 'শহরের ইতিকথা' গ্রন্থে সত্যেন সেন এর বর্ণনায় পাওয়া যায়।

নারায়ণগঞ্জের হতদরিদ্র পরিবারের মেয়ে সীতা দেহ ব্যবসায়ী দলের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়বারের মতো হাত বদল

BanglaBook.org

হয়ে ওস্তাদ গৌর বসাক নামের নামকরা তবলচির হাতে পড়েন। তিনি তাঁকে নাচ ও গানে তালিম দেন। তিনি খেমটাওয়ালিতে পরিণত হন। ঢাকার মানসী (পরবর্তীকালে নিশাত) প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ 'মেশিন ও মানুষ' নামের নাটকের মাধ্যমে তিনি অভিনয় শুরু করেন। পরে কলকাতায় তিনি অভিনয় করেন এবং শেষে হিন্দি থিয়েটারে অভিনয় করেন। তবে শেষাবধি সীতা গ্লানির জীবন থেকে গৌর বসাকের কল্যাণে সামাজিক জীবনে আসতে পেরেছিলেন। কারণ গৌর বসাক সীতাকে বিয়ে করে সে ব্যবস্থা করেছিলেন।

সরোজিনীর নেশাগ্রস্থ স্বামী ও সমাজের নির্দয় অত্যাচারের ফলশ্রুতিতে কী করে তিনি বাইজির পেশায় আসতে বাধ্য হলেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন সত্যেন সেন। 'শহরের ইতিকথা' গ্রন্থের ২০০৬ সংস্করণের ৬৪ পৃষ্ঠা থেকে সেই বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত হলো, তার স্বামী গাজার নেশায় টং হয়ে থাকত। আর ঘরে এসে বউ'র ওপর অমানুষিক অত্যাচার করত। একদিন অনেক রাতে টলতে টলতে এসে তার ওপর হুকুম জারি করল গাঁজা সেজে দে। সরোজনী সেদিন বিষম জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। স্বামীর এই আদেশের উত্তরে তিনি বললেন, আমি জ্বরের জন্য মাথা তুলতে পারছি না, কেমন করে গাঁজা সাজাব। স্বামী অগ্নিশর্মা হয়ে একটা টিকা জ্বালিয়ে লাল করে অসুস্থ স্ত্রীর গায়ের উপর চেপে ধরল।

সরোজিনী আর্তচিৎকার করে ঘর থেকে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। পরদিন তাকে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ঝোপের ধারে অচৈতন্য অবস্থায় পাওয়া গেল। তারপর? কোনো ঘরের বউ ঘর ছেড়ে সারা রাত বাইরে কাটিয়েছে। এমন অনাচার কেমন করে সহ্য করা যায়! সমাজের মোড়লদের বিচারসভা বসল। বিচারে-কুল-কলঙ্কিনী সরোজিনীকে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করার নির্দেশ দেওয়া হলো। এরপর নানা বিপর্যয়ের তরঙ্গে হাবুডুবু খেতে খেতে অবশেষে সরোজিনী, সরোজিনী বাইজিতে রূপান্তরিত হলেন। এই হচ্ছে সরোজিনী বাইজির বাইজিবৃত্তি অবলম্বনের পিছনকার নিষ্ঠুর ইতিহাস। এই দুর্ভাগা দেশের শহরে ও গ্রামাঞ্চলে এমন অজস্র ইতিহাস ছড়িয়ে আছে।

BanglaBook.org

আজও কি এই সমাজ থেকে সরোজিনী সৃষ্টির প্রক্রিয়া বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ কেউ নিয়েছে? অভাগিনী সরোজিনীরা আজও ভিন্ন নাম ও পরিচয়ে শুধু ক্ষুন্নিবৃত্তির আশায় সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে মহা অনিশ্চয়তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। অন্যের ক্ষণিকের আমোদের আগুনে নিজেদের গোটা জীবনের সুখ ও নিরাপত্তাকে এরা বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। বাইরে থেকে খেমটাওয়ালি ও বাইজিদের জৌলুসটাই শুধু দেখা যায়, কিন্তু তাদের ভেতরের দুঃখ-গ্লানি? সে খবর জেনে প্রাণ কাঁদে কজনের? কে জানে!

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

নারী ভাবনা: বাইজি গণিকা ঢেমনি

বিলু কবীর

আবরোঁয়া

নাচের সময় বিশেষ করে গানের সময় বা যখন এরই সাথে বাইজি নাচও গান করতেন তখন তার হাতের কাজ ও জরিখচিত রাজকীয় ধরনের পোশাকের সাথে মুখমণ্ডলে একধরনের স্বচ্ছ মিহি কাপড়ের নেকাব পরিধান করতেন। সাধারণত এই স্বচ্ছ বস্ত্র খণ্ডটির রং হতো সাদা বা গোলাপি। অন্য কোনো রং হলে তা অবশ্যই ঘনো নয়। এটি পরিধান বাইজি বাইজি চোখ আলগা থাকত। চোখের নিচ থেকে পুরো মুখায়ব সুস্পষ্ট দেখা যেতো।

বাইজির মাখোপরি এই নেকাবকে বলা হতো 'আবরোঁয়া, আবরোঁয়া' এক প্রকারের সুক্ষ্ম মসলিন কাপড় বিশেষ। এই কাপড় এতটাই সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ যে, তা পরিস্কার জলের মধ্যে রাখলে অনুমানই করা যেতো না যে এই জলের মধ্যে একপ্রস্ত কাপড় আছে। জলের মধ্যে রাখলেতা জলের সাথে একাকার হয়ে যায় বলেই এর নাম আবরোঁয়া।

BanglaBook.org

সম্ভবত এটি ফার্সি শব্দ। 'আব' মানে জল আর 'রোঁয়া'র অর্থ হলো মতো বা অনুরূপ। অর্থাৎ আবরোঁয়া হলো 'স্বচ্ছ জলের মতো।' সমসাময়িক আমলে মসলিন ছিল পৃথিবীবিখ্যাত। ধরন অনুযায়ী মসলিন কাপড়ের নামগুলো ছিল 'ঝুনা, শবনব, তনজিব, মলমল, রঙ্গ, খাস, আলাবালি, ভোরিয়া, জামদানি এবং আবেরোঁয়া। আরো অণ্য নামেও অনেক রকম মসলিন ছিল। উল্লেখ্যে যে, 'আবরোঁয়া'কে 'আবিরাওয়ান'ও (প্রবহমান স্বচ্ছ জলের মতো) বলার চল ছিল।

আবির

আবির রং বিশেষ। এর অন্যনাম ফাগ। আবির রং হিসেবে স্থায়ী নয়। সাধারণত ফাগ উৎসব, হোলি এবং অন্যকোনো আয়োজনে আনন্দের একটি ইভেন্ট হিসেবে রং খেলা করা হয়। এবং অন্যান্য রঙের চাইতে ব্যবহার্য হিসেবে আবিরের স্থানও কদর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং ঐতিহ্যবাহী। সাধারণ আবির ভুষো বা ধুলোর মতো শুকানো গুড়ো রং। বাইজি বাড়ির নাচঘরে এই রঙের কিছু কিছু রোমান্টিক ব্যবহার ছিল। যে ফরাসি বা গালিচার ওপর বাইজি নাচতেন তা মেঝের ওপর বিছানো থাকত। এরই নিচে চার ধার ঘেষে মিহি আবির রাখা থাকত। ফলে নাচের সময় বাইজির পায়ের আঘাতে সেখান থেকে আবিরের ধুলো বেরিয়ে পড়ে গিয়ে গ্রাহকদের পোশাককে ক্ষণস্থায়ী মেয়াদে রঙিন করে তুলতো। তখন সেই মৌচের মুজরোয় একটি আনন্দঘন স্বর্গীয় আবহের সৃষ্টি হতো।

উল্লেখ্য যে আবিরের বিশেষ মহাত্ম্য হলো তা কেবল রং ছড়িয়েই পরিপার্শ্ব ও হৃদয় মনকে রঙিন করে তোলে না। সাথে সাথে তা এক ধরনের সুগন্ধও ছড়ায়। অর্থাৎ সুগন্ধি ভুষো রং হিসাবে তার একটি অনন্যতা রয়েছে যা রোমান্টিক বটে।

আলতা

আলতা বা অলক্ত পা-রঞ্জনী বা লাল-তরল পদাভরণ। পায়ের শোভা বাড়ানোর জন্য বাইজিরা আলতা ব্যবহার করতেন। শিশিতে তরল

BanglaBook.org

আলতা আলতা পাওয়া যেত। কাঠির আগায় তুলো জড়িয়ে এক ধরনের ভোঁতা তুলি তৈরি করে তা চুবিয়ে চুবিয়ে পায়ের পাতার ওপরে চারধার দিয়ে আলতা লেপে দিয়ে টুকটুকে দৃষ্টিনন্দন করা হতো। পায়ের ওপরে উল্কার মতো করে আল্পনাও আবার বিশেষ চল ছিল। (আলতা নিলাম পায়/ সোনা নিলাম গায়/ দেখেন তো দুলাভাই কেমুন দেখা যায়! লোকছড়া, কুষ্টিয়া)।

আশনাই

আশনাই বলতে হৃদয়ঘটিত অসক্তি, প্রণয়, ভালোবাসা ইত্যাদিকে বোঝায়। তবে এর মধ্যে কিছু নোংরামি, অশোভন, অবৈধতা, অসামাজিক প্রবনতা রয়েছে। একেবারে আদর্শ প্রেম বলেও যা বোঝায়, প্রেম হলেও 'আশনাই' ঠিক তা নয়। বরং তির্যকভাবে হলেও কঠাক্ষ করে 'দিললাগি' ফেলসানি' বলতো যা বোঝায় আশনাই ব্যাপারটি ঠিক সেই রকমের। এককথায় একে বৈধতাবহির্ভূত প্রেম বলা যেতে পারে। সে আমলে বাইজি, বারবনিতা, পরস্ত্রীর সাথে পুরুষের এই ধরনের প্রেমের ঘটনা ঘটত। নারীর ক্ষেত্রেও ঘটত তার পরিমাণ অবাঞ্চিতকর। তাছাড়া পুরুষেরা যে ধরনের পূর্বপরিস্থিতির কারণে।

একজন বাইজি, বেশ্যা বা পরনারীকে ঢেমনি রাখত বা রক্ষিতা হিসাবে উপপত্নিতে গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন তাকেও 'আশনাই' বলা যেতে পারে। পরকীয়াও আশনাইয়ের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চরিত্রের হীনতা বা স্খলন রয়েছে বলে কোনো কোনো গ্রামদেশে একে 'ইলিকুশি' এবং 'নট' ও বলা হয়। (মন যত বলে আগা নাই, হৃদে তত জাগে আশনাই -কাজী নজরুল ইসলাম। আপনার নাম বাহ/ আমাকে আশনাই দেহ- সৈয়দ হামজা)।

ইন্দুবালা দেবী

ইন্দুবালা দেবীর (১৮৯৮-১৯৮৪) জন্ম অম্বরে। তিনি ছিলেন নামকরা গাইয়ে। নাচিয়ে এবং অভিনেত্রী। ছোটবেলায় মায়ের কাছে গানও অভিনয়ের হাতেখড়ি। তার মা রাজবালা ছিলেন সার্কাসের

BanglaBook.org

খেলুড়ে, অভিনেত্রী এবং সংগীত শিল্পী। বিভিন্ন সংগীতে তার ছিল অগাধ তালিম। তিনি গৌরীশংকর মিত্র, জমিরুদ্দিন খাঁ কাজী নজরুল ইসলামের কাছেও সংগীতশিক্ষা করেছিলেন। ১৯২০ সালে তার গানের রেকর্ড বেরোয় 'হিজ ভয়েস' থেকে। কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠার পরদিন থেকেই সেখানে তার গান পরিবেশন শুরু হয়। তিনি নাট্যাভিনয় শুরু করেন ১৯২২ সালে। প্রথম সিনেমায় অভিনয় করেন ১৯৩১ সালে। পরবর্তী ১৫ বছরে তিনি প্রায় পঞ্চাশটি চলচিত্রে অভিনয় করেন। অসংখ্য গান করেন বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও ভারতীয় অন্যান্য ভাষায়।

বিপুলসংখ্যক গানের রেকর্ড রয়েছে তার কণ্ঠে। এই এত বড় মাপের ইন্দুবালাও একবার ঢাকায় এসেছিলেন গানের আসরে। তখন ঢাকায় নাচ গানের সমঝদার সৃষ্টি হয়েছিল। আমলে আনার মতো। তো কতটা উচ্চমার্গীয় ছিল সেই নাচ গানের ঢাকা? উত্তরটি পাওয়া যাবে ইন্দুবালার একটি কাণ্ডে। ঢাকায় আসার আগে তিনি কালিঘাটের মন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করলেন- 'মা ঢাকায় যাচ্ছি, ঢাকা তালের দেশ, মান রাখিস মা।'

এনাম

এনাম বা ইনাব মানে বকশিস। পুরস্কার বা খুশি হয়ে হিসাবের পাওনার অতিরিক্ত সম্প্রদান। অর্থে বা বস্তুতে। দেখুনঃ বকশিস।

কলকাতা

কলকাতার বয়স ঢাকার চাইতেও কম। শহরপত্তনের দিক থেকে এই হিসাব যথেষ্ট। এছাড়াও অবিভক্ত ভারত আমলে কলকাতার যে রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাতে ঐতিহ্যের দিক থেকে ইতিহাসগর্ভ হিসাবে কলকাতা পুরনো মহিমায় উজ্জ্বল। ফলে বয়ঃক্রমে কম হলেও কলকাতায় অনেক কিছুই ঢাকার আগে। স্বাভাবিক।

এই কলকাতায় ১৮৫০ সালে পরে বাইজিদের আগমন ঘটে। জানা যায় নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ (১৮২২-১৮৯৭) অযোদ্ধা থেকে

BanglaBook.org

বিতাড়িত হয়ে কলকাতায় আসেন। এখানে এসে তিনি মোটিয়া বুরুজ এলাকায় নির্বাসিত হিসাবে বসবাস করতে থাকেন। তারই কল্যাণে এখানে এক ধরনের মজলিসি গানের আসর বসতেও শুরু করে। এই সংগীতের মজমাকে কেন্দ্র করে কলকাতায় বাইজিদের আগমন শুরু হয়। এই বাইজিরা আসতেন প্রধানত এলাহাবাদ, বেনারস, লখনৌ, আগ্রা, পাঠনা, বারোদা, দিল্লী প্রভৃতি এলাকা থেকে। তারা রাগসংগীত পরিবেশন এবং তার সাথে শাস্ত্রীয় নাচ প্রদর্শন করতে পটু ছিলেন।

এই সময়ে বা প্রাথমিককালে আগত বিখ্যাত বাইজিদের মধ্যে ছিলেন নিকি, আসরণ, জিন্নাত, বেগমজান, হিন্দুলা মীর্জাজান, নান্নীজান, সপনজান প্রমূখ। পরবর্তীকালে বিখ্যাত বাইজিরা হলেন শ্রীজান, মুশতারী, মাশকাজান, গওহরজান, জদ্দনবাই, জানকী (ছাপ্পান্ন ছুড়ি), জোরোবাঈ, অবদনবাই, নাছমিবাই, নীলম, রোশন আরা, আমতারী, রসুলুন, কালীবাই, হীরাবাই,কেশরবাই, মুন্নী, স্বরস্বতী, কালিজান, আমিরজান, গাদু, বিদ্যাধরী, সিদ্ধেশলী প্রমূখ। (বাংলাপিডিয়া ৬ষ্ট খণ্ড প্রধান সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, প্রথম মুদ্রণ মার্চ ২০০৪ পৃষ্ঠা ৩৩৩)।

কাঞ্চনী

সেটা সতেরো শতকের প্রথম দিককার কথা। মুঘল আমলের ঢাকা। সেই সময়ে সুবাদার ইসলাম খাঁর পরিষদ ঘরে চিত্তবিনোদক বা মৌজের জন্য নাচ গানের আসর থাকত।

পরবর্তীতে যারা বাইজি অভিধা পান ঠিক তাদেরই বৈশিষ্ট্যের নারী সেই আসরে গান নাচ পরিবেশন করতেন। তাদেরকে সে সময়ে বলা হতো 'কাঞ্চনী'। 'কাঞ্চনী' নামকরণের মধ্যে তাদের শ্রীসুরত এবং লাস্যের আভাস অনুমান করা যায়। খুব ভেবে চিন্তে তাদরেকে এই বিশেষণাত্মক নামটি যে দেয়া হয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। 'কাঞ্চনী' মানে সোনালি রঙা। এক ধরনের সুশোভিত ফুলের নামও কাঞ্চনী বটে। এক প্রকারের ধান পাকলে

BanglaBook.org

সোনার রং ধারণ করে বলে তার নামও কাঞ্চন বা কাঞ্চনী। কাঁচা অর্থে কাঞ্চনী বললে ডাগর বা কচি লাস্যময়ীনও বোঝায়। এসব চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারই সাথে তুলনীয় বিবেচনায় বাইজিদের ওই রকম নাম দেয়া হয়েছিল বলে ভেবে নেয়ার যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত কারণ রয়েছে।

কানবালা

কারবালা হলো কানে পরার গয়নাবিশেষ। এই কর্ণাভরনটি জবররং দৃষ্টি আকর্ষক। এটিকে বাইজিরা নাচ-গান পরিবেশনের সময় পরতেন। কানবালা কানের সাধারণ রিঙের চাইতে অনেক বড়। 'অনেক বড়' মানে এতটাই বড় যে আকৃতির দিক থেকে তা হাতের চুড়ি বা বালার সাথে তুলনীয়। এই বালার সাথে উপমেয় এবং সেটা কানের গয়না বলেই এর নাম 'কানবালা'।

কারচুপি

কারচুপি এক ধরনের নয়নাভিরাম সূচিশিল্প। এর অন্য নাম কামদানি। এর মাধ্যমে পরিধেয় পোশাকে নানা রকম নকশা করা হয়। বলাই বাহুল্য কাজটি করতে নানা রঙের সুতোর ব্যবহার থাকে। এছাড়া জরি, চুমকি, পুথি, আয়না, চকমকি কাজ ইত্যাদি বসিয়ে কাপড়টি সাজানো হয়। কাঠের বড় ফ্রেমে আটকে নিয়ে কাপড়ের ওপর ওইসব কাজ করা হয় বলেই হয়তো এর নাম হয়েছে কারচুপি- কাটচুপি-কাঠচুপি। বাইজিদের নাচের পোষাকে ব্যাপক পরিমাণে এই কারচুপির কাজ লক্ষ করা যায়।

খানকিবাজি

বেশ্যা বা যৌনকর্মীদেরকে সে আমলে নানা নামে ডাকা হতো। এমনকি প্রশাসনিক ভাষায় পর্যন্ত খানকি, ছুকরি, বাররমণীর মাতা শব্দ ব্যবহারের চল ছিল। আর এসবের মধ্যে খানকি এবং মাগী শব্দ দুটির চল ছিল সবচেয়ে বেশি। সে কারণে বেশ্যা রমনির দেহে উপগত হওয়াকে বলা হতো মাগীবাজি বা খানকিবাজি। যে নারীরা দেহব্যবসা করতেন তাদের ঐ ব্যবসাকে জীবিকা নির্বাহের শ্রমকে বলা হতো খানকিগীরি।

BanglaBook.org

সাধারণ মানুষের এধরনের দেহসম্ভোগকে ভালো চোখে দেখা হতো না এবং তাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে নানা তীর্যকবানে আহত করা হতো। কিন্তু অবস্থাপন্নরা নানা কৌশলে যখন এসব করতেন তাকে ঘৃণা করা হলেও যাচ্ছেতাইভাবে সেক্ষেত্রে মন্তব্য মূল্যায়ন করার চল ছিল না।

উল্লেখযোগ্য ঢাকা শহরে বিশেষ করে পুরান ঢাকায় গালি হিসাবে 'খানকি' শব্দটি বহুল চল এখনও লক্ষ করা যায়। অন্তত 'খানকির পোলা, তোর মায়েরে..' এই ঢাকাইয়া খিস্তির প্রচলনকে অস্বীকার করার উপায় এখনও নেই।

খেমটা

খেমটা বলতে প্রচলিত অর্থ এক ধরনের নাচকে বোঝায়। কিন্তু আদপে খেমটা 'কোনো' নাচ নয়, তা বরং সংগীতের একটি তাল বিশেষ। এই তালের সংগীতের সাথে যে নাচ করা হয় তাকে বলা হয় খেমটা নাচ। এই ধরনের গানের সাথে নাচার প্রচলন বাইজিদের সাধ ছিল বলে তাদেরকে 'খমটাওয়ালী'ও বলা হতো। খেমটা অনেক নর্তনকুদন বলতে যা বোঝায় তেমনি। বেসামাল দেহভঙ্গি, উদ্দিপক ঝাঁকানাকা ধরনের এই নাচে নানান দৈহিক আবেদনের সৃষ্টি হবার উপক্রম থাকে। সেই জন্য খেমটা নাচ' কথাটি তির্যক কটাক্ষবাচক ঋণাত্মক বাগধারা হিসাবেও উচ্চারিত হয়।

খাসকুদানি

খাসকুদানি সৌখিন ক্ষুদ্রকায় পাত্র বিশেষ যা সাধারণ পেতলের তেরি। রাজ-রাজারা ও জমিদার বাড়িতে কিছু কিছু অতি সৌখিনতার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে রূপোর খোসবুদানির চল ছিল। তবে সাধারণ বাইজিখানা ও বাইজিবাড়িতে পেতলে খোসদানি ব্যবহার করা হতো।

তিনটি পায়ার ওপর একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট পিরিচের মতো। তার ওপরে পদ্মফুলের কুঁড়ির মতো একটি ডিম্বাকার খোল। তাতে কবজা দিয়ে লাগানো একটা ঢাকনি। এর ভেতরে সুগন্ধি বা আতর দিয়ে ভেজানো

BanglaBook.org

তুলো থাকত। বাইজিবাড়িতে নাচ গানের মেহফিলে ঐ খোসবুদানিকে গ্রাহকদের মাঝে দেয়া থাকত্ তারা পাত্রটির ঢাকনা খুলে আঙুলে মেখে বা ভেজা তুলোর কিছুটা ছিঁড়ে নিয়ে তা পোশাকে মাখতেন। তার গন্ধে পুরো নাচঘরটি সুগন্ধে ম-ম করতো।

গিলে করা পাঞ্জাবি

গিলেফল আসলে এক প্রকার পাহাড়ি ফলের বিচি। লতানো গাছে শিমের মতো। শিমের তুলনায় সহস্রগুণ বড়। তার এক একটা বিচি পূর্ণ বয়স্ক মুরগির গিলে বা পাকস্থলীর মাপে বড় এবং দেখতে ঐ গিলের মতো বলেই এর এই রকমের নাম। পুরনো আমলে কাপড়ে কুঁচি দিতে দরজিরা এই ফল ব্যবহার করতেন। বাবু কালচারের যেসব বিলাসি বাঙালিরা বাইজিবাড়িতে যেতেন তারা আভিজাত্যের প্রতীক গিলে করা পাঞ্জাবি পরিধান করতেন। সাদা মিহি আর্জির চিনেপল ও ঘন মাড় দেয়া ইস্তিরি করা পাঞ্জাবির দুই হাতা গিলে করে স্টাইল করার বিশেষ চল ছিল। গিলেফলের সাহায্যে দুই হাতাকে কুচকে খোঁচ ফেলে ছোট করে আনা হতো। তাতে হাতাদুটোর গুটোর বিকল্পে ক্রেপড পেপারের মতো লাগত। ফুল হাতাকে লাগত হাফ হাতার চাইতে লম্বা, থ্রি কোয়ার্টারের চাইতে ছোট।

এই ধরনের পাঞ্জাবিতে থাকত সোনার চেনে সংযুক্ত সোনার বোতাম। বা বুকে পকেটে মূল পকেটের ভেতরে ঘড়িপকেট। সেই পকেটে মূল পকেটের ডান দিকের ফুটো দিয়ে ঢুকি রাখা হতো বিলেতি পকেটঘড়ি। এই ঘড়িও সোনার চেনে বাধা থাকতো। চেনের অপর প্রান্তের হুক উক্ত বোতামের সাথে আটকে রাখা হতো।

গোট

গোট একধরনের অলংকার। যাকে মাজার বিছার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। এই ভারি গয়নাটি সাধারণত রূপা বা চাঁদির তৈরি। যা বাইজিরা তাদের আকর্ষণীয় কোমর বা কাঁখ পেঁচিয়ে পরতেন। মাজায় পেঁচিয়ে পরার পর গোট অগ্রভাগে, নাভির নিচে লুলায়িতবাবে সামান্য ঝুলে থাকতো বলে নৃত্যমুদ্রায় কোমর হেলানো দুলানোর সময় দৃষ্টিনন্দন লাগতো।

BanglaBook.org

গোলাপি নেশা

বাইজিবাড়িতে লভ্য অনেক ব্রান্ডের মদের মধ্যে রেডলেভেল, রেডওয়াইন ইত্যাদির রং ছিল গোলাপি বা ঘাটতি অথবা বাড়তির দিকে গোলাপির কাছাকাছি। এবং বলা বাহুল্য এটি পান করলে নেশা হতো। সে কারণে গাঢ় মদের নেশাকে গোলাপি নেশা বলা সীমিত চল ছিল। একই ধরনের মদকে লালপানি বলারও চলছিল। দেখুন: লালপানি)।

গুরবাঁক

গুরবাঁক এক ধরনের পায়েল বা নূপুর। যা বিশেষ করে নাচ পরিবেশনের সময় বাইজিরা পরিধান করতেন। মধ্যশ্রাব্য ঝংকার-নিক্কনের জন্য নর্তকীদের পায়ের প্রধান গয়না থাকতো নূপুর ও ঝুমুর। নূপুর বা ঝুমুর বা এই জাতীয় পদ-অলংকার কেবল জোরদার বাজনার উৎপাদক। দেখতে অতটা নয়নাভিরাম নয়। নাচ উপভোগ করতে গিয়ে কখনো গ্রাহকের নজর বাইজির পায়ের দিকে গেলে যে সেই পদ-অঙ্গকে মলিন না লাগে সেই প্রত্যাশায় তারা ঝুমুরের নিচে আলোচ্য সুদৃশ্য সহায়ক 'গুরবাঁক' পরতেন।

ঘাগরা

নাচ পরিবেশনের সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাইজিরা যে পর্ণবস্ত্র ব্যবহার করতেন, ঘাগরা পাজামা জাতীয় তার অন্যতম পরিধেয়। ঢিলে-ঢালা পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত লম্বিত এই পোশাক নানা মুদ্রার নাচের জন্য বিশেষ অনুকূল। এই পাজামাটিকে ঘাগরি বলারও চল আছে। এটি মূলত উত্তর ভারতের এবং বিশেষ করে রাজপুতনী অথালের নারীদের পোশাক।

ঘাগরার সম্পূর্ণ উল্টানুরূপ পাজামার নাম 'চুড়িদার পায়জামা'। এই পায়জামার নিচের দিকটা ক্রমশ সরু বেশ আঁটোসাটো। প্রয়োজনের তুলনায় এটি অনেকখানি বেশি পরিমানে লম্বা থাকে। সেই অংশকে কোঁচবানানোর মতো করে গোড়ালির ওপরে ভাঁজ করা থাকে। চলতি

BanglaBook.org

বাংলায় একে চোষপায়জামা বলে। কী বৈশিষ্ট্যের নাচ হবে তার ওপরে নির্ভর করতো যে বাইজি ঘাগরা পরবেন নাকি চুড়িদার পায়জামা পরবেন।

ঘুঙুর

ঘুঙুর বা ঘুংরু এক ধরনের ভারি গয়না। নাচের সময় বাইজিরা এই অলংকারকে পায়ে পরতেন। একটি চামড়ার ছিলায় অনেকগুলো ঘুঙুর সাজিয়ে বেধে এই অলংকার তৈরি। পায়ে বাঁধার জন্য এর দুই পাশে দুটো ফিতে থাকে। নাচের মুদ্রা অনুসারে পা নেড়ে এবং মেঝেতে পা ঠুকে বাইজিরা নিক্কনে সেই ফিল গুলজার করতেন। ঘুঙুর সবসময় পেতলের তৈরি। পেতলের মুখ পাড়া খোল দেখাও অনেকটা লম্বাটে নটকোর মতো। এর নড়াচড়া করলে তার আগাতে বাজনার সৃষ্টি হয়।

চিক

চিক গম্ভীর ও ভারি মেজাজের জবরজং কণ্ঠভূষণ। বাইজিদের কণ্ঠমূলে তা দেখতে অনেকটা চওড়া ফিতে বা বিছের মতো। তার নিচের দিকে বুক অবধি ঝুলায়মান ঝুল, ঝালর রাজকীয় ভঙ্গীতে শোভা পায়। ঝালরগুলো ক্রমশ ছোট হতে হতে নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় তাকে দেখতে উল্টো পিরামিডের মতো লাগে।

চুড়ি

চুড়ি হাতে পরা অলংকার হিসাবে বাইজিদের জন্য ছিল অপরিহার্য। বিশেষত নাচের সময়। কেননা হস্তভঙ্গিতে উৎপাদিত চুড়ি রিনিঝিনি শব্দ তার দেহবল্লবীর লাস্যকে বাড়িয়ে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতো। তারা এক্ষেত্রে সাধারণত রেশমি বা যাকে বলে বেলোয়াড়ি চুড়ি পরতেন। মেটালিক চুড়ি পরারও চল ছিল। বেলোয়াড়ি বা রেশমিচুড়ি পরা হতো ব্লাউজের বা পোশাকের অবৈধ অংশের কাপড়ের বা তার হাতার রঙের সাথে মিলিয়ে। বিশেষত হাতার রং এ ক্ষেত্রে বেশি প্রভাবক হিসেবে কাজ করতো। কনুই অবধি নেমে আসা হাতা আর কনুই অবধি উঠে আসা চুড়ির সারি পাশাপাশি

BanglaBook.org

হওয়ার এই ম্যাচিং বিশেষ দৃষ্টিনন্দন হতো। বাইজিদের নাচে গানে কমবেশি বেলাল্লাপনা ছিল সত্য। কিন্তু তাদের পোশাক পরিধেয় সে কালের বুঝ অনুযায়ী পরিগণিত ছিল। বিনাহাতা ব্লাউজ কখনো তাদের পরিধেয় ছিল না বলে মনে হয়।

চুড়িদার পায়জামা

নাচের সময় বাইজিরা প্রয়োজনবোধে আঁটোসাটো ধরনের এই চুড়িদার পায়জামা পরতেন। এর ঠিক বিপরীত বৈশিষ্ট্যের পায়জামার নাম ঘাগরা। এটিও বাইজিরা পরিধান করতেন (দ্রষ্টব্য: ঘাগরা)।

ছাপ্পান্ন ছুরি

বাইজি জানকীবাই ঢাকায় ছাপ্পান্ন ছুরি নামে খ্যাত এবং পরিচিত ছিল। নিজের নাম উপচে এই নামে (যা কোনো উপাধিও নয়) কেন তিনি খ্যাত হলেন তার পটভূমিতে এক বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে।

জানকীর বাড়ি ছিল বেনারস। তার নাচ-গানের ওস্তাদের নাম ওস্তাদ হাস্‌সু খান। হাসসু খান ছিলেন লখ্‌নৌর মানুষ। এই শিষ্য এবং গুরু উভয়ই ছিলেন কিংবদন্তী। এলাহাবাদের মেয়ে হয়েও তিনি থাকতেন ঢাকায়। তার রূপ এবং নৃত্যগীতের গুণ ছিল অপরিমেয়। সে সময়ে ঢাকার নাচ-গানের জন্য তার পারিশ্রমিকই ছিল বেশি। সেই ১৯০৯-১০ সালেই তার একদিনে পাশ্রিমিক ছিল ১৫০০ টাকা। একাধারে তিনি ছিলেন কবি এবং ইংরেজি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী।

তার কবিতাগ্রন্থের নাম দিওয়ানই জানকী। ১৯১১ সালে রাজা পঞ্চম জর্জ এলাহাবাদে গেলে তার সম্মানে যে গানের আসর বসানো হয় তাতেও গান করার জন্য জানকী নির্বাচিত হন। অসম্ভব গুণবতী এবং অপরূপ রূপবতী জানকী ছিলেন ঢাকার এক নবাবের রক্ষিতা বা উপপত্নী। নবাব তার রূপে এতটাই দিওয়ানা ছিলেন যে তার কাছ থেকে তাকে যেন কেউ নিয়ে না চলে যায় বা সে পারেন সেই প্রত্যাশায় তিনি জানকী রূপ যৌবনকে খুঁতো করে দিতে ৫৬ বার ছুরির আঘাত করে কুতসিৎ করেছিলেন। এই কারণে তিনি 'ছাপ্পান্ন ছুরি' নামে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছিলেন।

BanglaBook.org

ছুকরি

বেশ্যা রমণীদেরকে প্রাচীনকালে ‘ছুকরি’ বলার চল ছিল। খানকি বলার চলতো ছিলই। এখন শব্দদুটিকে যতো অসম্মানজনক মনে হয় তখন বুঝিবা ততোটা ছিল না। কারণ ১১৮০ সালের ১২ শ্রাবণ তারিখের একটি বারবনিতার জমির ইচ্ছাপত্রে কঞ্চীবাইয়ের উইলে প্রাপকদের নামের শেষে ‘খানকি’ ‘ছুকরি’ এই শব্দগুলোর ব্যবহার দেখা যায়। একেবারে রাষ্ট্রযন্ত্রের দলিলে লিখিত।

উদ্ধৃতি কঞ্চীবাই এর উইল/ শ্রী আল্লাহ মহামহিম জয়া ছুকরি ও হানু ছুকরি/ লিখিতং শ্রীমতি কঞ্চী বাই কার্য বেলাত পত্রমিদং কার্য্য- আমার বাস্তু দলত যে আছে তাহা আমি দুই ছুকরিকে দিলাম কেহ দাওয়া করে সে ঝুটা। ইতি সন ১১৮০ তেরিখ ১২ শ্রাবণ/ ইসাদি/ শ্রী নিমা খানকি/ সাং মাছুয়াবাজার/ শ্রীমতি খানকি গোআলনী/ সাং মাছুয়া বাজার’। (অবিদ্যার অন্তঃপুরে, আবুল আহসান চৌধুরী, প্রকাশক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, ৪৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা- ১১০০, ফেব্রুয়ারি ২০১০ পৃষ্ঠা ৩৯৩)।

উপরোক্ত গ্রন্থে উক্তরূপ আরেকটি উইলে শ্রীমতি পার্বতি বেশ্যা, এই রকমের একটি নাম পাওয়া যায়।

জড়োয়া

জড়োয়া মনিমুক্তা এবং ঝুলানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুমকা বসানো মোটাভারি চুড়িবিশেষ। রাজকীয়, অভিজাত মূল্যবান। বিশেষ নাচ-গানের কোনো আসরের আয়োজন হলে বাইজিরা জড়োয়া পরতেন। তাতে মণিমুক্তা, চকচকি পাথর ইত্যাদি বসানো থাকতো বলে আলো ঝলমল নাচঘরে অঙ্গসঞ্চালন করাও করতে বাইজির দেহপল্লবীকে নয়নাভিরাম লাগতো। এর সাথে যে ঝুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝুমকো থাকতো। তারপর মূল জড়োয়াকাণ্ডে যে সেঁকড়ার করা নকশা থাকতো, তাসরও আলোকসম্পাত ও হাত সঞ্চালনের জন্য চকচক করে ঝুলছে উঠতো। (জড়োয়ার ঝুমকো থেকে একটি মণি খসে পড়েছে-মান্নাদে)।

BanglaBook.org

ঝুনা

ঝুনা একধরনের ঢাকাই মসলিন কাপড়। এই মিহি নয়নাভিরাম মসলিন কাপড়ের কথা এখানে বিশেষভাবে এই জন্য উল্লেখযোগ্য যে, এই কাপড়ের পোশাক মূলত নর্তকী বা বাইজিরা ব্যবহার করতেন। সেকালে যে কয়েক ধরনের ঢাকাই মসলিন তৈরি হতো তার মধ্যে মূল্যমানের দিক দিয়ে মাঝামাঝি বা নিচের দিকে অবস্থান ছিল এই ঝুনা'র। তবে এটি ছিল নয়নাভিরাম, মিহি এবং আরামদায়ক। এই ঝুনা পরিধানের গুণে বাইজি নারী আরও লাস্যময়ী, আকর্ষণীয় হয়ে উঠতেন।

তাদের যারা গ্রাহক অর্থাৎ রাজরাজারা, জমিদার, সৌখিন আমলা, কিংবা বাবুকালচারের বিলাসী ধন্যরাও এই কাপড়ের পোশাকে আবৃত বাইজিকে পছন্দ করতেন। এছাড়া অন্যান্য নর্তকীরাও এই কাপড় দিয়ে নাচের পোশাক তৈরি করতেন। সে কারণে কলকাতা ঢাকা অঞ্চলে ঝনা, নাচের পোশাকের জন্য বিশেষ যোগ্য কাপড় বলে স্বীকৃতি পেয়েছিল।

টারসেল

টারসেল এবং বাংলা নাম ঝুল। এটি হচ্ছে একগুচ্ছ কালো লম্বা মিহি সুতো। দেখতে মেয়েদের চুলের মতো। একমাথা জড়ো করে বাঁধা, অন্য মাথা উন্মুক্ত। উন্মুক্ত প্রান্তে পুঁথির দানা দৃষ্টিনন্দন মেটালিক চাকতি, রঙিন সুঁতার নকশার বাঁধন ইত্যাদি থাকত। বাইজিরা টারসেলকে চুলের সাথে মিলিয়ে কেশসজ্জা করতেন। এতে করে তাদের চুলের পরিমাণ বেশি দেখাতো। ফলে তাকে আরও বেশি আকর্ষণীয় লাগতো। একে উইগ বা নকল কেশের বিকল্প বলা যেতে পারে।

ঢাকা শহর

ঢাকা শহর ইতিহাসে খ্যাতি প্রসিদ্ধি পায় মুঘল আমলে। যদিও তার আগেই শহরটি কিছু কিছু গুরুত্ব পেয়েছিল। আসলে সেটি ছিল

BanglaBook.org

ঐতিহাসিক খ্যাতি পাবার প্রক্রিয়া শুরু। ডাকা যখন প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও বণিজ্যিক গুরুত্ব পেতে শুরু করে তখন এখানে ভৌত অবকাঠমোর সাথে সাথে নাগরিক প্রয়োজন মেটাতেও নানান ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়। মানসকাঠামোর উন্নয়ন এবং চিত্তবিনোদন তারই একটি অপরিহার্য অংশ। ফলশ্রুতিতে এখানে ক্লাব, সরাইখানা নাট্যপালা, বায়োস্কোপ, কার্যভাল, বেশ্যালয়, বাইজিখানা প্রভৃতির সুযোগ প্রসারিত হয়।

মুঘল আমলে যে ঢাকা সামাজিক রাজনৈতিক প্রসিদ্ধ শুরু হয়। ঠিক ঐ সময়েই এখানে বাইজিদের নাচ-গানের আরম্ভ। ১৯ শতকে ঢাকায় বাইজি সংস্কৃতি প্রবল রমরমা হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এই কালপর্বে নবাব কামরুদ্দৌলা, নবাব আবদুল গণি, নবাব আহসানুল্লাহ প্রমুখ বাইজি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। আহসান মঞ্জিলে ছিল 'রঙম-হল' দিলকুশায় ছিল বাগানবাড়ি' আর শাহবাগে 'ইশরাত মঞ্জিল'। এসব জায়গায় বাইজিদের নাচ গানের আসর বা মেহফিল বসতো।

পুরনো আমলে ঢাকার বিখ্যাত বাইজিরা হলেন সপনজান (লখনৌ), মুশতারীবাই, এলাহিজান, পিয়ারিবাই, হীরাবাই, ওয়া-মুবাই, আবেদীবাই, আন্নু নান্নু, নওয়াবিন বাই, বাতানি, জামুরাদ, পান্না, হিমানী, আমিরজান, রাজলক্ষ্মী, কানি, আবসন প্রমুখ।

এছাড়া ঢাকায় অবস্থান করতেন না এমন কলকাতাবাসী বাইজি, যারা ঢাকাতেও খ্যাতি পরিচিতি পেয়েছিলেন এমনরা মালকাজান বুলবুলি, ইন্দুবালা, মালকাজান আগারওয়ালী, জানকীবাই, গওহরজান, জদ্দনবাই, হরিমতি প্রমুখ। গওহরজান কণ্ঠশিল্পীখ্যাতিও অনেকেই উচ্চ স্তরের ছিলেন তা যাচাইয়ের সুযোগ বাস্তবে কম ছিল। কারণ তারা গান-নাচ পরিবেশনকে রুটিরুজির অবলম্বন হিসাবে গ্রহন করেছিলেনণ শিল্পীখ্যাতি নাম যশোর দিকে তাদের প্রণতা ছিল না। তদুপরি গওহারবাই উপমহাদেশের প্রতম শিল্পী যিনি গ্রামোফোন রেকর্ডে কণ্ঠদান করেছিলেন। জদ্দনবাই পরবর্তীতে চলচ্চিত্র অভিনয় করেছিলেন। ইনি হচ্ছে ভারতীয় চলচিত্রাভিনেত্রী নার্গিসের মা।

BanglaBook.org

দেবীবাই ঢাকার প্রথম নির্বাক সিনেমা ' দি লাস্ট কিস' এ অভিনয় করেছিলেন। হরিমতি বাইজির কণ্ঠে নজরুলগীতির গ্রামোফোন রেকর্ড বেরিয়েছিল। কোনো কোনো বাইজি ঢাকা কলকাতায় অভিজাতবাড়ির বিয়েতে জলসায় আমন্ত্রিত হয়ে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে গান পরিবেশন করতেন। ঘটনাটি কলকাতায়।

একটি আসরে মোস্তারিবাই পূরবীরাগে খেয়াল পরিবেশন করেন। তার ঐ পরিবেশনা এতটাই উচ্চমার্গীয় ছিল যে পরবর্তী শিল্পী ফৈয়াজ খাঁ এনায়েত খাঁ এবং হাফেজ খাঁর মাতা সাত্রীয় ওস্তাদও মঞ্চে উঠতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন।

রাজা নবাব, জমিদারদের পতনের ফলে বাইজিরা পৃষ্ঠপোষকতা এবং গ্রাহকের আকালে পড়েন। কালে ধীরে ধরি বাইজি সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। (বাংলাপিডিয়া ৬ষ্ট খণ্ড প্রধান সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম প্রথম মুদ্রণ পৃ ৩৩৪)।

ঢেমনি

ঢেমনি হচ্ছে উপপত্নী বা রক্ষিতা স্ত্রী। ঢাকায় এবং বিশেষত কলকাতার বাবু কলোচারে সৌখিন ঋণী এবং বিলাসী পুরুষদের মধ্যে এই রকমের ঢেমনি বা উপপত্নী রাখার চল ছিল। কেউ কেউ বিষয়টিকে এক ধরনের আভিজাত্যের প্রতীক বলে বিবেচনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। উপপত্নী আর রক্ষিতা কথা দুটোর মধ্যেই গভীর সমাজচিত্র রয়েছে। 'উপ' মানেই মূলের অসমকক্ষ। অর্থাৎ তিনি স্ত্রীর মতো তাকে মর্যাদা ও অন্যান্যসবের সমান উত্তরাধিকারী নন। তাকে সাধারণ ভাড়াবাড়িতে বা স্বামী প্রবরের অন্যবাড়িতে মূল স্ত্রী হতে দূরে রাখা হতো।

মূলত তার সাথে স্বামীর দৈহিক সম্ভোগেরই সম্পর্ক। তবে বারবি-নতার মতো তার ভরণপোষণ ইত্যাদির জন্য অন্যকারো মুখাপেক্ষি হওয়া লাগতো না। উপপত্নী হিসাবে স্বামীর কাছ থেকে তিনি এইসবের সরবরাহ পেতেন। রক্ষিতা হবার মধ্যে স্বামীর সদয় প্রযত্ন পাবার বিষয়টি স্পষ্ট। মানে তার নির্ভরতার নির্ভয়তা থাকতো। এই স্বামীর ওর সে আমলে একাধিক রক্ষিতা রাখারও চল ছিল। তো এই

BanglaBook.org

ঢেমনি কথাটি বাইজি আলোচনায় এইজন্য প্রাসঙ্গিক যে, কোনো কোনো বাইজি তাদের গ্রাহকদের সাথে প্রণয় সম্পর্কে অভিসারিকা হয়ে উঠতেন পরিণতিতে তারা বাইজি পেশা ছেড়ে তার উপপত্নী বা রক্ষিতার জীবন বেঁচে নিতেন। আর এমনও হতে ঐ বাইজি এককভাবে কেবল তার রক্ষকপতির মনরঞ্জনার্থে প্রয়োজন মতো নাচ-গান করতেন। আবার এর অন্যথাও হতো। অর্থাৎ উপপত্নী রক্ষিতা এবং বাইজি।

তয়ফা

তয়ফা হলো নর্তকীদল। এটি আসলে বহুবাচনিক শব্দ। নচনীকেও তয়ফাওয়ালী বলার চল ছিল এটি বোধহয় ফরাসি অথবা আরবি শব্দ। বাইজিখানাকেও কখনো কখনো দুই বা ততোধিক বাইজির দলীয় নাচের আসর বসতো। এই নাচকে বলা হতো তয়ফা। তয়ফাওয়ালীদেরকে সুন্দরী অপ্সরীদের সাথে তুলনা করে এই ধরনের বাঙালি ফূর্তিক্ষেত্রে একঝাঁক ডানাকাটা পরি কথাটির চল হয়। সোজা কথায় নারীদের দলীয় নৃত্তকে তয়ফা বলা যেতে পারে।

তাকিয়া

তাকিয়া এক ধরনের সৌখিন বালিশ। সাধারণ বালিশের মতো আয়তাকার চৌকো চ্যাপটা নয়। বরং ঠিক কোলবালিশের মতো গোলাকার। তবে লম্বায় দুই ফুটের মতো লম্বা। এই বালিশের ওপরে একটি কারুকাজময় শোভাবর্ধক আচ্ছাদনী থাকে। তা সাধারণত ঘনো রঙের। এর ওপর কারচুপি ও সেলাই ফোঁড়াইয়ের নকশা থাকে। দেখতে অভিজাত এবং রাজকীয়।

বাজিখানায় সম্মানীত গ্রাহক যে গারিচা বা ফরাসের উপর বসে দারুটান ও নাচ উপভোগ করেন। সেখানে তার দুই পাশে দুটো উক্ত তাকিয়া রাখা হয়। ঢাকা কলকাতাসহ এতদঞ্চলের সমাজ বাস্তবতায় বাইজিবাড়ি ছাড়াও অন্যান্য মাহফিল, মজমা আসরেও (এমনকি ধর্মীয় জমায়েত মঞ্চেও) এই তাকিয়ার এই রকমের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর কভারে সূচিকর্ম ও কারচুপির কাজছাড়াও জরি,

BanglaBook.org

সালমাজরি ইত্যাদির শোভা বর্ধন করে। উল্লেখ যে এই তাকিয়ার কভারের মুখ দুইদিক থেকেই খোলা থাকে। দুই মাথায় পাজামার মতো আংটা বা ফিতে পরানো থাকে। তাতে তাকিয়া দিয়ে এ ফিতে এেট বেঁধে দেয়া হয়।

নখপালিশ

নেইল পলিশ থেকে নখপালিশ কথাটি এসেছে। নেইলপলিশ বা নখপালিশ বা নখবঞ্চনীর ব্যবহার মেয়েদের মধ্যে এখনও পুরোমাত্রায় চায়কি পূর্বের যে কোনো সময়ের চাইতেও এখনর আরো অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। এখন যেমন নানান রঙের নখপালিশ পাওয়া যায়, আগেকার দিনে রঙের এত বৈচিত্র ছিল না। সাধারণত দুই রঙের নখপালিশ পাওয়া যেত। ঘনো লাল এবং গোলাপি। সমাজ সাধারণত মেয়েদের মধ্যে এর ব্যাপক ব্যবহার ছিল। বাইজিরা এই প্রসাধনি দিয়ে তাদের হাত এবং পায়ের নখ রঞ্জিত করে নর্তকী হিসাবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রয়াস পেতেন।

নাচঘর

নাচঘর হলো রাজরাজারা এবং জমিদারবাড়ির একটি মিলনায়তন বা অংশ যেখানে চিত্ত বিনোদন নাচ-গান নেশা তামাশা ফুর্তির আয়োজন বাস্তবায়িত হতো। নাচঘরের অন্য নাম রংমহল। অর্থাৎ আনন্দ ফুর্তিকে কেন্দ্র করেই এই নাম। নিজেদের বাধা বা ভাড়া করা বা অন্য বিশেষ নর্তকী বাইজিকে আমন্ত্রণ করে ওখানে আনা হতো। রাজা জমিদার একা বা অতিথি সমবিব্যবহারে এই নারী নাচ গান উপভোগ করতেন। সেখানে সরাব আফিম, গরগরা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকতো।

এই ঘর হতো রাজকীয় শানশওকতে সাজানো। বাজনদারেরা বাজনা বাজাতেন। নর্তকী বা ততকীরা সেই সময়ে নাচতেন গাইতেন এবং উপভোগীদেরকে সরাব ইত্যাদিতে আপ্যায়ন করাতেন। এখানে মেঝেতে ফরাস বা দামি গালিচা বিছিয়ে বসার

BanglaBook.org

ব্যবস্থা থাকতো। এই গালিচার নিচে আবির বা সুগন্ধি রঞ্জক পদার্থ থাকতো। নর্তকীকে বা বাইজির নৃত্তপটু পদাঘাতে সেই আবীর উড়ে উড়ে ভোক্তার পোশাক রঞ্জিত রোমাঞ্চিত হতো। তা এক ধরনের উৎসব এবং অন্তরে বিশেষ আবেদন সৃষ্টিকারী সুগন্ধ ছড়াতো। নাচঘরে ঝাড়বাতি, মূল্যবান দীপাধার, পানপাত্র, শোভাবর্ধক তাকিয়া আরাম ও বিলাসব্যসনে সহায়কী ভোগ্য ও উপভোগ্য খাদ্য অখাদ্য যাবতীয় সামগ্রী থাকতো।

নেকাব

নেকাব হলো মেয়েদের মুখমণ্ডলের ওপরে কাপড়ের অবগুণ্ঠন। বোরকার যে লুলায়িত লম্বিত কাপড়টুকু নারীর কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত ঢেকে দিয়ে কণ্ঠ পর্যন্ত নেমে আসে পৃথক করে সেইটুকুকে নেকাব বলা যেতে পারে। এটি মূলত বাদশাহী এবং শেরিফ পরিবারে নারী সদস্যদের পর্দাপুর্সিদা সমৃদ্ধ পোশাক। আসলে সূক্ষ্ম বিচারে নেকাব এমন একটি আচ্ছাদনী, যা পরলে পরিধান কারীর মুখায়বব কেউ দেখতে পারবেন না অথচ ঐ নারী সবকিছু দেখতে পারবেন। এতদঞ্চলে শালিনতার প্রতীক আব্রু হিসেবে নাচ-গানের সময় বাইজিরা এক ধরনের মিহি ফিনফিনে স্বচ্ছ কাপড়ের নেকাব পরিধান করতেন। পাতলা স্বচ্ছ কাপড় বলে তাদের মুখমণ্ডলকে ধুপছায়ার গোধুলী মায়াবতিে রোমান্টিকভাবে চাক্ষুসমতো করা যেতো।

তদুপরি তদের নেকাবের একটি বিশেষত্ব ছিল। এই নেকাব পরার পরপরও বাইজির কপাল চোখে আলগা থাকতো। নানা মুদ্রার আবেদন সৃষ্টিকারী নাচ করতে করতে একসময় বাইজি ঝটকা টানে তার নেকাব খুলে ফেললে তার প্রসাধন করা সুন্দর মুখখানি স্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হতো। এবং এই ঘটনা ঘটামাত্র আগত গ্রাহকরা মাতাল বেসামাল বা স্বাভাবিক অবস্থায় মারহাবা মারহাবা বলে মনখোশ প্রকাশ করতেন। তোমার সকল প্রেম আবার লুকাতে চায় নেকাব প্রচ্ছায়।

BanglaBook.org

নূপুর

নূপুর নারীদের পায়ে ধারণের গয়না বিশেষ। বিশেষ করে নৃত্যশিল্পী এবং নর্তকীদের কাছে এর বেশি সমাদর। নূপুর পরে হাঁটলে দৌড়ালে নাচলে যে ঝংকারের সৃষ্টি হয়। তাকে বলা হয় নিক্কণ। নূপুরের অন্যনাম ঘঙুর, ঘুঙুর শিঞ্জনী। (নূপুরকার বাজে ঝিমঝিম বাংলা গান। নূপুর বাজে তার ঝিমিঝিমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

পুরান ঢাকা

পুরান ঢাকা পুরান আমলের কথা। তার বিভিন্ন এলাকায় ছিল বেশ্যাপাড়া আর বাইজিপাড়া। বাইজিদের নাচুনে এবং বেশ্যাপাড়ায় মাগিপাড়া। সেসময়ের গঙ্গাঞ্জলী আর সাচিবন্দর এলাকায় বিস্তীর্ণ পরিসর জুড়ে পাটুয়াটুলির মোড় থেকে যে রাস্তাটি বুড়িগঙ্গার দিকে গেছে ওয়াইজঘাট নামে সেইটির নাম ছিল গঙ্গাঞ্জলী। দিনের আলো ভিতো আর পুরো এলাকা সেতারের মোহন বাহজনে নূপুরের নিক্কনে ঝুমুরের ঝনঝনে সাথে ডুগি তবলার বোলে যাকে বলা হয় মুখরিত হয়ে উঠত। পাড়ায় পাড়ায় সাহেব আর বাবুকালচারের নাগরিকদের ভিড় জমে যেতো।

ভোরের দৃশ্যটি আরও মনোহরী। তখনতো আর বাইজিপাড়া একজনও গ্রাহক নেই। দিনের আলো ফুটেছে কি ফোটেনি। বাইজি দলবেধে বুড়িগঙ্গায় স্নান সেরে চপচপ ভেজা শাড়িতে ঘরে ফিরছেন। সিক্ত পূর্ণবক্ষের ওপর ততোধিক ভেজা একফালি গামছা। কাঁখে জলভর্তি চকচকে কাঁসার কলস। মাজা মাজায় মাজা কাঁসার কলস, তার ওপর পেছনে পড়ছে সকালের কাঁচা সোনা রোদ।

প্রতিশব্দ: বাইজি বেশ্যা ঢেমনি

নর্তকী, নাচিয়ে, নাচনেওয়ালী, নর্তন নাচদারী, খেমটাওয়ালী বহি, বাইতয়ফা, বাইতয়ফাওয়ালী, দেবদাসী, উপপত্নী, উপস্ত্রী, রক্ষিতা, ঢেমনি, রাখনী, নাগবী, মাগ, অবৈধপ্রনয়ণী, গণিকা, বেশ্যা, বারবনিতা,

BanglaBook.org

বরবধূ, বারযোষিৎ, কামলেখা, কামরেখা, দেহপসারিনী, কপোপজীবিনী, রূপজীবা, হট্টবিলাসিনী, বাজারের মেয়ে, বারোভাতারি, জনপদবধূ, নগরনটী, নগরনাটনী, নাটনী, নটীদারী, পন্যঙ্গনা, পনাঙ্গনা, পেশকারদারী, কসবি, কুচনী, কটুনি, ধমড়ি, বাঁড়, মাগী, রণ্ডা, রাণ্ডি, খানকি, ছিনাল, ছেনাল, লম্পটি,খুকি, সঞ্চারিকা, কুম্ভা, মঞ্চিকা, অজ্জুকা, লজ্জিকা, অবিদ্যা, ক্ষুদ্রা, মঞ্চিকা, পুংশ্চলী, পুংস্কামা, ধর্ষিনী, হর্ষকারিনী, রতায়নী, খেরেলি, প্রেষণি, সঞ্জিবক, স্পর্শা, রাজনটী, স্বর্বধু, গণিকাশ্রেষ্টা, বারমুখো, অপ্সরা।

এগুলো উল্লেখযোগ্য বাইজি, গণিকা ও ঢেমনির প্রতিশব্দ, সংশ্লিষ্টশব্দ বা প্রসঙ্গশব্দ। এগুলোর প্রতিটির বিস্ময়কর ব্যুৎপত্তিগত সমাজ পটভূমি রয়েছে। সেটি করা গেলে সুস্পষ্ট বোধগম্য হবে যে, এই শব্দগুলোর নির্মাতা পুরুষ ছাড়া কোনো নারী নন।

ফুর্তি

ফুর্তি মানে আনন্দ বটে। কি বাঙালিদের সে কালের ঢাকা ও কলকাতা- এই শব্দটির মধ্যে কিছুটা কটাক্ষ আছে। আনন্দ অর্থে ফুর্তি আমোদ, প্রমোদ বিনোদন, হুল্লো, খুশি, উল্লাস তামাশা উপভোগ বটে। কিন্তু ফুর্তির শেষটি ইতিবাচক নয়। মৌজ বঙ্গবস দিললাগি এই ফুর্তিবাচক শব্দগুলো ফষ্টিনষ্টির ইঙ্গিত দেয়। রতিসম্ভোগ উপগত রমন ইত্যাদির গন্ধ রয়েছে শব্দটির মধ্যে। তো বাইজিরা এতে নাচ গান রমনীর সাথে সাথে মদ্যপানের বিষয়টিও বহুল পরিমানে থাকায় এখানকার মৌজ বা আনন্দ উপভোগকে সাধারণ 'ফুতি' বলার চল রয়েছে।

বেশ্যাপাড়ায় রমনোপভোগকেও ফুর্তির কটাক্ষে উচ্চারণ করা চল ছিল। যাকে বলা হতো লুচ্চামী বা লম্পটের রঙ্গতামাশা।

বুঁদ

বুঁদ মানে হলো বিভোর, বেহুঁশ বেসামাল, অপ্রকৃতিস্থ। অর্থাৎ প্রচুর মদ পানের ফলে পাঁড় মাতালের যে অস্বাভাবিক অবস্থা দাঁড়ায় সেটিই বুঁদ বা বেসামাল অবস্থা।

BanglaBook.org

বাইজিবাড়িতে এই রকমের বহু মাতলামির ঘটনা ঘটতে। এসব মাতলামি এবং বাইজি বাড়িতে গ্রাহকেরা কেবল আনন্দ উপভোগের নিমিত্তে নয় অনেক দুঃখ ভুলে থাকার জন্য বাইজিবাড়িকে অবলম্বন হিসাবে নিতেন। অর্থাৎ কেবল নেশাভাং মজালোটা নয়। বাইজিবাড়িতে অনেক করুণ আলেখ্য মানবিক বিপর্যস্তের দিশা খোজার দুঃখ কষ্টের গর্পও অজানা থেকে যেতো। তাদের অনেকের সাথে বাইজির মানবিক এবং এদের অনেকের সাথে বাইজির মানবিক এবং প্রেম সম্পর্ক সৃষ্টি হতো তখন বাইজি আর কেবল পেশাজীবির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেন না। অন্য কোনো মহৎ নারীর স্থান দখল করে বসতেন। নেশার লাটিম ঝিম ধরেছের এই ঝিম হলো বুঁদ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বকশিস

বকশিস হচ্ছে হিসাবের যে পাওনা খুশি হয়ে তার অতিরিক্ত সম্প্রদান। অথবা হিসাবে কোনো পাওনাই নাই। তদুপরিও সন্তুষ্ট হয়ে কিছু পারিতোষিক দেয়া এই দেয়াটা আর্থিক অবস্থা বস্তুগত হতে পারে। বাঙালি সংস্কৃতিতে নাচ-গান অভিনয় যাদু। ভেলকি বীরত্ব, ভালো কোনো অর্জন ইত্যাদি ক্ষেত্রে বকশিস দেয়ার চল এখনও আছে। বাইজিদেরকে গ্রাহকেরা নাচ গানের পারিশ্রমিকে অতিরিক্ত বকশিস দিতেন। যেটা ছিল নর্তকী গাইয়ের প্রতি তাদের সমুদ্ধ খুশি হবার বহিপ্রকাশ । এই বকশিস সাধারণত হতো নগদ টাকা। খুব পুরনো আমলে অভিজাত হলেও কা রো ধাতুমুদ্রা, পরবর্তীতে কাগুজে নোট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই বকশিস দেয়ার সময় দাতা থাকতেও ফুর্তিতে মশগুল মাতাল। তিনি মুঠো মুঠো নোটের টাকা বাইজির প্রতি ছড়িয়ে দিতেন।

বাঙালি টাকা উড়ানোর বাগধারটি সেখান থেকেই আসা। বহুক্ষেত্রে মদ্যপ বিলাসী আমোদপ্রিয় গ্রাহক নিজের কণ্ঠদেশের সোনার হার চেন, অঙ্গুলিয় সোনার বোতাম খুলে বাইজিকে বকশিস দিতেন। এই বকশিসকে এনাম বা ইনামও বলার চল ছিল।

BanglaBook.org

সাহিত্য বাস্তবতায় এমন এমন ঢের নজির রয়েছে যে অতিরিক্ত বাইজিব্যয়ের কারণে যেমন বেশিমাত্রায় আসর উপভোগ পানাহার বকশিস প্রবণতার মাত্রধিক্য বা মোহে অনেক নবাব জমিদার রাজা ধনী বিলাসী ডাকসাইটে মানুষ ভীষণ আর্থিক বিপর্যয়ে পতিত হয়েছেন। বকশিস চাইনা মালিক হিসাবের পাওনা চাই- বাংলা মজলিসি গান।

বডিস

বডিস হচ্ছে কাঁচুলি বা ব্রেসিয়ার । নারীর বক্ষবন্ধনী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাদের উর্ধ্বাঙ্গের অন্তর্বাস। বডিস ইংরেজ শব্দ। ব্রিটিশ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আমলে প্রচুর ইংরেজি শব্দের প্রচল ঘটে ভারত উপমহাদেশে। সে আমলে এই শব্দটি প্রয়োগ ছিল। এখন তার স্থানটি দখল করে আছে ব্রেসিয়ার'। বাইজিদের বডিস ব্যবহার ছিল নানা কারণে অন্য রকম নাচের সুবিধার্থে তাদের শরীরকে আটোসাঁটো রাখা দরকার ছিল। নিজেকে আকর্ষণীয় এবং নৃত্যের লাস্যকে দৃষ্টিগোচর করতে তারা এক ধরনের ব্রেসিয়ার ব্যবহার করতেন যা অনেকটা খুব খাটো ব্লাউজের মতো। তাতে পয়োঃধর দুটিকে দেখানো এবং ওপরের দিকে ভরাট স্তনের ব্যথা স্পষ্ট। যাকে অনেকটা সেঙ অ্যাপেইলিং বলা যেতে পারে। নাচে তাদের ঝাকানাক ধরনের বুকের কাজও দেখাতে হতো। ফলে তাদেরকে মোটা বড় বক্ষবন্ধনী পরিধান করতে হতো, যাকে বড় ব্লাউজের মতো লাগতো। ঐ ধরনের কিছুটা ব্রীড়াহীন ব্রেসিয়ার সমাজের সাধারণ নারীরা পরতেন না।

বাইজি

বাইজির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো সম্ভ্রান্ত নারী। অভিজাত এবং উচ্চবংশীয় নারীদের নামের শেষে এই ক্যেলিনবোধক বংশ পদবী যুক্ত হবার চল মূলত ভারতের রাজপুতনা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে এই পদবীর চল।

BanglaBook.org

সামাজিক নানা বাস্তবতায় পশ্চিম ভারতীয় সেইসব নারীরা বাইজি বলে প্রতিষ্ঠা পান, যারা একাধারে কণ্ঠশিল্পী এবং নর্তকী। এবং তারা পেশা হিসাবে তাদের এই দুই ধরনের শিল্পীসত্তাকে চর্চা করতেন। এককথায় তাদরেকে পশ্চিম ভারতীয় অঞ্চলের পেশাদার গায়িকা-নর্তকী বলা চলে। তারা একই সাথে গাইতেন এবং নাচতেন। এই সংগীত নাচকে বলা হতো বাইনাচ। মূল শব্দটি আসলে 'বাই'। বেশি শেবিফ উচ্চারণ 'বা'। যেমন মহাত্মা গান্ধীর (১৮৬৯-১৯৪৮) মায়ের নাম পুতলিবাঙ্গ এবং স্ত্রীর নাম কস্তুরবাই বা কস্তুরা।

'বাই'; হিন্দিভাষার শব্দ। এর সাথে 'জি' সম্ভ্রান্তবাচক এবং সম্মানবাচক শব্দালংকারটি যুক্ত হয়ে 'বাইজি'তে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাইজিরা নিজ ব্যবস্থাপনায় বিনোদনমূলক নাচ গানের দরবারি ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। সেখানে সমাজের উচ্চ পর্যায়ের সৌখিন ধনী ব্যক্তিরা চিত্তবিনোদনের জন্য আসতেন এবং অনুষ্ঠান উপভোগ করে ইচ্ছা ও আপন মর্যাদানুযায়ী বাইজিকে অর্থ প্রদান করতেন।

বাইজিখানা

বাইজিখানা আর 'বাইজিবাড়ি' একই অভিধান। দ্রষ্টব্য: বাইজিবাড়ি।

বাইজিবাড়ি

বাইজিবাড়ি বলতে সেই বাড়িকে বোঝায়, যেই বাড়িতে গ্রাহকদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে বাইজির নাচ গানের আসর বা মেহফিল বসত। বাইজি ঐ বাড়িরে মালিক বা ভাড়াটিয়া। আবার অনেক ক্ষেত্রে এমনও হতো যে কোনো 'মাসি' (জনৈক নারী) ঐ বাড়ির মালিক বা ভাড়াটিয়া তিনিই বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ঐ বাড়িতে বাইজির নাচ গানের আসর বসিয়ে থাকেন। বাইজিবাড়িকে বাইজি-খানা বলারও চল ছিল। এই রকমের সমাজ বাস্তবতা এখন আর নেই। তবে সে আমলে বাঙালি বসতাঞ্চল বলতে ঢাকা এবং কলকাতা শহরে এই ধরনের বিনোদন ব্যবস্থার চল ছিল।

BanglaBook.org

এ ক্ষেত্রে কেবল একজন বাইজি নাচ গানের ব্যবস্থা থাকত। যদি কোনো নির্দিষ্ট এলাকা জুড়ে একের পর এক অনেকগুলো বাড়িই 'বাইজিবাগি' হতো তাহলে ঐ এলাকাকে 'বাইজিবাড়ি' না বলে বাইজিপাড়া বলা হতো।

বাগানবাড়ি

বাগানবাড়ি বনেদি চাল সমাজে এখনও কিছু কিছু বিদ্যমান, যা পুরনো আমলে রাজ-রাজারা, নবাব, জমিদার, সমাজের অবস্থানপন্ন বাবু, বাহাদুরদের এক বা একাধিক বাগানবাড়ি তার আভিজাত্য, ধনাঢ্য এবং ঠাটের পরিচায়ক ছিল। নানা ওছিলা আয়োজনে তারা একা বা সঙ্গী সঙ্গ সমবিব্যহারে বাগানবাড়ি এসে দুচ্চার দিন অবস্থান করে জীবন প্রতিদিনের একঘেয়েমি কাটিয়ে যেতেন। এই বাগানবাড়ি মানেই শখের নির্মাণ। সেখানে থাকা খাওয়া গান নাচ পান, ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকতো। তো সেই সুবাদে বাগানবাড়ির মালিকের আগমন উপলক্ষে গান ও বাইজি নাচের ব্যবস্থা হতো। সে জন্য হয় বাইজি ভাড়া করে অথবা বাধা বেতনভুক্ত বাইজিকে সাথে করে আনা হতো।

সেখানে ঢেমনি, রক্ষিতা উপপত্নিদেরও আনা হতো বা মালিক আসার আগেই তাদেরকে সেখানে এনে রাখা হতো। অনেকসময় মালিক, রাজরা, নবাব, জমিদারেরা শিকার এবং তার সাথে বাগানবাড়িতে রাত্রিযাপনের প্রোগ্রাম জুড়ে নিয়ে এক ঢিলে দুই পাখি। এখানে পটভূমি হিসাবে এত কথা বলার যুক্তি হলেঅ এই বাগানবাড়ির সাথে বাইজি নাচের একটি অপরিহার্য যোগ ছিল। অনেক সময় রক্ষিতা বা ঢেমনিরা স্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করতেন।

বাজনদার

বাইজির নাচ গানের সাথে সাথে বাজনা বাজানোর যে বাদকদল থাকে তাদেরকে বলা হতো বাজনদার। নাচঘরে সুবিধামতো জায়গায় বসে তারা বাজনা বাজাতেন।

BanglaBook.org

স্বভাবত হারমোনিয়াম ডুগি তবলা প্রধান বাদ্যযন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হতো। সাথে বাঁশি খঞ্জনি ইত্যাদি ধরনের বাদ্যযন্ত্র থাকতো। বাজনদাররাও পাতপক্ষে জরির কাজওয়ালা আলখাল্লা ধরনের পোষাক পরিধান করতেন। মাথায় নকশাদার টুপি পরার চল ছিল তাদের হারমোনিয়ামের স্বর সাধারণত চড়া থাকতো।

বিবেকানন্দ স্বামী

খেতাবি রাজার রাজসভা। সেখানে কোনো কারণে উপস্থিত স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। সেই রাজসভায় গান গাইবেন একজন বাইজি। কিন্তু স্বামীজি দ্বিধাকল্পিত অন্তরে বেঁকে বসলেন। একে নারী তার ওপরে পের বাইজি মানে নর্তকী। অতএব এ গানতো শোনা যাবে না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাছোড় রাজার সনির্বন্ধ অনুরোথে তিনি রাজী হতেন। বাইজির অন্তরেও বিশেষ রক্তক্ষরণ। স্বয়ং স্বামীজিকে গান শোনানোর ভাগ্য কয়জনের হয়। তিনি গাইলেন-

‘ প্রভু মোর অবগুন চিতনা ধর
সমদরশি হ্যায় নাম তোমার
এক লহো পূজামে রহত হ্যায়
পরলোক মন দ্বিধা নাহি হ্যায়
দুই কাঞ্চন করো।’

ততক্ষণে স্বামী বিবেকানন্দের চোখে অশ্রু গড়াচ্ছে। মানুষকে আনন্দ দেয়ার জন্য যারা নিজেদেরকে বিলিয়ে দেন, তার বঞ্চনা ও অন্তর্শোক কতটাই নিরবধি বহমান। গান শেষ হলে স্বামী বিবেকানন্দ তাকে ‘মা’ ডাকলেন! (এই সময় ২৭ আগস্ট ২০১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা ৩২, সম্পাদক আরিফুর রহমান, পৃষ্ঠা ৯২)।

বোতেল

বোতেল বলতে বেশ্যা, পতিতা, গনিকা, বীরাঙ্গনা, নারী যৌনকর্মী, দেহাপসারিনী, বারবনিতা, কাপেপজীবনী, হর্ম্যবিলাসিনী, কসবি, খানকি, ছিনাল, অবিদ্যা, নটি, এদেরকে বোঝায়।

BanglaBook.org

কিন্তু বোতেল শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত ব্যাকরণে এরা যৌনকর্মী হিসাবে সমমাত্রিক হলেও সবাই 'বোতেল' নন। বোতেল আসলে সেই বেশ্যা বা পতিতা, যিনি ভাসমান বা অন্যকোনো উপায়ে নন বরং বেশ্যাপাড়া মাগীপাড়া, খানকিপাড়ায় বা বা যাকে বলে প্রস্টিটিউশনে অবস্থান করে দেহব্যবসা করেন। বোতেল শব্দটি এসেছে ইংরেজি ব্রোথেল (Brothel) থেকে। সে আমলে বিশেষত খুরনার বানিয়াশান্তা, নারায়ণগঞ্জের টানবাজার, কলকাতা, ঢাকা ইত্যাদি অঞ্চলে সরকার অনুমোদিত বড় বড় গণিকালয় বা বেশ্যাপাড়া গড়ে উঠেছিল।

বিশেষত ব্রিটিশ সৈন্যদের যৌন ক্ষন্নিবৃত্তি বিষয়টি এর পেছনে বিবেচনা হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছিল। ইংরেজ বণিক, নীলসাহেব এরাও অনেকেই বহুগামী ছিলেন। তাদের ভাষায় মাগীপাড়া বা পতিতাপল্লীর নাম ছিল ব্রোথেল। এই ব্রোথেলই কালে কালে বাঙালি উচ্চারণ আড়ষ্ঠতায় 'বোতল' এ রূপান্তরিত। চরিত্রহীন ভ্রষ্টা নারীদের উদ্দেশে কুষ্টিয়া অঞ্চলে 'বোতেল মাগী' একটি গালিবিশেষ।

মাসি

মাসি হচ্ছেন মায়ের বোন বা খালা। সে আমলে বাইজিবাড়িতে একজন সরদারনী ধরনের গার্জিয়ান নারী থাকতেন। যিনি বাইজিবাড়িতে এক বা একাধিক বাইজির নাচ গান পরিচালনা করতেন। অনির্দিষ্ট হলেও বাস্তবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল তাকে মাসি বলে সম্বোধন করা। মাসিকে বাইজিকবাড়ি এবং সেখানকার অনুষ্ঠান পরিচালনাও গ্রাহকের চাহিদার অনুকূলে নানা ব্যবস্থা ও সরবরাহ করতে হতো। তিনি সাধারণ বয়েসি বা মধ্যবয়েস অতিক্রান্ত নারী হতেন।

বাঙালির বেশ্যালয়েও এই রকমের মাসি থাকতো। যৌনকর্মী সংক্রান্ত নানা ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির সাথে তিনি জড়িত। তাকে বলা হতো পাড়ার মাসি বা মাগীপাড়ার মাসি। প্রথমোক্ত এবং শেষোক্ত দুই মাসিই যথাক্রমে বাইজিদের কাছে সমীহযোগ্য এবং মান্য ছিলেন।

BanglaBook.org

দুই ক্ষেত্রের গ্রাহকদেরকে দুই ক্ষেত্রের মাসি সামাল দিতেন। বাইজির নাচ গান এবং বেশ্যার দেহব্যবসা ক্ষেত্রে মূল কর্পোরেট মুনাফাটি মাসির নিয়ন্ত্রনে থাকতো। তাদের বাহ্যিক চারিত্র্য ছিল বাজখাঁই ধরনের ধেনো এবং অবাগি চড়া।

মেহফিল

মেহফিল 'মহফিল'এর অন্যরূপ উচ্চারণ। মহফিলকে মাহফিলকে বলা বলা হয়। এছাড়াও মহাফিল, মফিল, মহাফেল, উচ্চারণেও কমবেশি চল আছে। তার এবং মূল। শব্দটি 'মোআফেল'। এটি সম্ভবত ফার্সি শব্দ যদি ফার্সি না হয় তাহলে আরবি। যাই হোক 'মেহফিল' এর অর্থ হচ্ছে আসর, মজমা, জমায়েত সভা একত্রিত হওয়া। তো বাইজিখানায় এই মেহফিল শব্দটি চল রয়েছে। সেখানে নাচ ও গানের যে আসর হয় তাতে একাধিক আমোদাস্বাদনের আগমন ঘটে বলে যথার্থই তাকে মেহফিল বলা হয়। তবে বাইজিখানার যে মেহফিল তার একটা বিশেষত্ব আছে। সেটা হলো এখানে চেয়ার টেবিলে বা অণ্যকোনো আধুনিক ধরনের আসকাবে বসার ব্যবস্থা হয় না। ঘরে মেঝেয় বসার ব্যবস্থা করা হয়। মেঝেতে বসা হলেও সেই আয়োজনে রাজকীয় বিলাসী এবং অভিজাত ভাবটি বেশ বজায় থাকে।

মুজরো

বাইজিদের নাচ এবং গানের যে আন্‌জাম বা আয়োজন ব্যবস্থা, তবে সাধারণত আসর, মাহফিল, মজমা বলা হতো। এর বাইরে মেহফিল, মহফিল, মহাফিল, মহাফেল। মাহফিলে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাইজি নাচতেন এবং গাইতেন। এছাড়া কোনো কোনো বাইজি রাজ রাজারা, নবাব, জমিদারদের বাঁধা মাসিক বেতনভুক্ত ছিলেন। কমবেশি আসর মেহফিল যাই হোক শেষোক্তরা মাস শেষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ মাসোহারা হিসাবে পেতেন। উপর্যুক্ত বিভিন্ন নাম ছাড়াও বাইজি নাচ-গানের আসরকে সে আমলে 'মুজরো' বলার চল ছিল।

BanglaBook.org

রক্ষিতা

রক্ষিতা আসলে উপপত্নি বা ঢেমনিরই আরেক প্রতিশব্দ। ইংরেজিতে যাকে বলে 'কেপ্‌ট'। দেখুন ঢেমনি।

রতনচূড়

রতনচূড় হাতে পরিধানের রাজকীয় গয়নাবিশেষ। যা নাচ-গানের সময় বাইজিরা পরিধান করতেন। এটি এমন একটি জমকালো গয়না যে তার মধ্যে একই শেকলে আঁটা পাঁচ আংটি একটি ব্রেসটেন এবং একটি নকশাদার চাকতির (রাখির মতো) সমাবেশ থাকে। এর পাঁচটি আংটি পাঁচ আঙুলে পরে কব্জিতে টেনে ব্রেসলেটের মতো এঁটে দিতে হয়। মাঝখানে রাখির মতো একটি নকশাদার চাকতি। এটি আসলে পাঁচটি অঙ্গুরীয় এবং ব্রেসলেটকে অবিভাজ্য করে ধরে রাখে। রতনচূড় পরলে পরে এই চাকতিটির অবস্থান হয় হাতের পাতার ঠিক উল্টো দিকে।

বাইজিরা নৃত্যমুদ্রার সময় যখন সজ্জিত নখে, কাঁকনসজ্জিত হাতে অপূর্বসব ভঙ্গি প্রদর্শন করেন। তখন এই রতনচূড় চোখ ঝলসানো চমক গোচরীভূত হয়। মণিকারের নকমা ছাড়াও তাতে নয়ননন্দন পাথর-মণি মুক্তা বসানো থাকে। তা ছাড়াও থাকে মীনা ও গিলটির কারুকার্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাইজির গান শুনে স্বামী বিবেকানন্দ চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। গান শেষে তিনি সেই নর্তকী ডেকেছেন 'মা', এই কথা এই রচনার কোথাও বলা হয়েছে। এইবার রবীন্দ্রনাথ সাথে নজরুলও।

১৮৭০ সালের কথা। ঢাকার নবাব আবদুল গনির আমন্ত্রণে গান গাইতে আসেন। বাইজি মোস্তরিবাই। যাকে বলা হতো মেহফিল বা মুজরো, মানে ঐ আসর বসল শাহবাগের বেগুনবাড়িতে। ঐ বাইজি মোস্তারি জানতেন সুরের সম্মোহন। শ্রোতাদের বশ-মুগ্ধ করার এক জাদুকরী ক্ষমতা তার।

BanglaBook.org

তিনি গানের মূর্চ্ছনায় মুগ্ধ করলেন আবদুল গাফ্‌ফার নাসকানকে। নাসকান ছিলেন সে আমলের খ্যাত উর্দু কবি। এরপর মোস্তারিবাই সংগীত পরিবেশন করেন কলকাতায়। বলাই বাহুল্য এইসব উচ্চমার্গীয় আসরে শোতা হিসাবে আমন্ত্রণ পেতেন অগ্রসর মেধার জ্ঞানী-গুণী অবস্থপন্নরা।

কলকাতায় তার গানে মুগ্ধ হলেন রাইচাঁদ বড়াল আর কঞ্চচন্দ রায়। এদের সাথে সাথে আরেকজন সংগীতজ্ঞ কবি সেই গানে বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন। সেই মানুষটির নাম কাজী নজরুল ইসলাম। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। তখন মোস্তারীর গানে মুগ্ধ আরও একজন কবি ও সংগীতজ্ঞের নাম বলব । তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবিশ্যি ঐ আসরের শ্রোতা ছিলেন না। তিনি কলকাতা বেতারে তার গান শুনে এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে গান শেষে টেলিফোন করেন কলকাতা বেতারকে। ওরা তো অবাক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ফোন। তারের ভেতর দিয়ে ঠাকুরের কণ। কণ্ঠস্বর, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'এই দেবীকে কোন গন্ধলোক থেকে নিয়ে এলে?' (এই সময়, ২৭ আগস্ট ২০১৭, সংখ্যা ৩২ সম্পাদক আরিফুর রহমান)।

লালপানি

লালপানি বলতে গড়পরতা মদকে বোঝানো হতো। বাইজিবাড়িতে সে আমলে যে মদ বা নেশাকর পানীয় পরিবেশন করা হতো, তা সব সাধারণত বিলেতি মদ। সাধারণত এগুলোর রং থাকতো ঈষৎ হলদেটে, লালচে এবং সাদা। কিন্তু 'রেডয়াইন বা সেই জাতীয় পানীয়গুলোর রং থাকতো ঘনো লাল। এটি সবচেয়ে সুদৃশ্য এবং অনেকের প্রিয় পানীয় হওয়ায় কলকাতা কেন্দ্রীক বাইজিখানাসহ বার বা ব্যক্তি আয়োজিত পানের আসরে মদকে 'লালপানি' বলা হতো। গোলাপি রঙেরও এক কিসিমের মদ পান করার চল ছিল। সে কারণে কলকাতা ঢাকায় মাতলামোকে বলা হতো 'গোলাপি নেশা'। রেডলেভেল ব্রান্ডের পানীয়টির রঙও গোলাপি বটে।

BanglaBook.org

লাস্যময়ী

খুবসুন্দরী, কামোদ্দীপক, পূর্ণযৌবনা বিস্তৃত নিতম্বীনি, ভরাটবক্ষা, আকর্ষণীয় দেহী নারীকে সাধারণত 'লাস্যময়ী বলা হয়। সে আমলে বাইজিদেরকেও এই অবিধায় বিশেষায়িত করা হতো। কিন্তু 'লাস্য' বিষয়টি দেহসংশ্লিষ্ট নারীর শরীরনির্ভর হলেও তা ঠিক নারীরদেহই নয়। বরং লাস্য হলো এক প্রকারের নাচভঙ্গি এবং লালাসমৃদ্ধ দেহভঙ্গি যা অবশ্যই নারীর জন্য প্রযোজ্য। যা বিশেষ করে পুরুষদের মনোহরী। এককথায় ভরাযৌবন নারীর উত্তেজক নৃত্যভঙ্গিই হচ্ছে লাস্য। দেহ নয় বরং দেহভঙ্গি।

হেরেম

হেরেম বলাও আক্ষরিক ব্যুৎপত্তিতে বোঝায় রাজপ্রসাদ বা জমিদার বাড়ির নির্দিষ্ট সীমার ভেতরের মহল। যেখানে তাদের নারীরা অবস্থান করেন। নারী বলতে রানি, রাজকুমারী, রাজমাতা, রাজা জমিদারের উপপত্নিগণ নারী কর্মচারীগণকে বোঝায় আরবি ও ফার্সি ভাষায় হেরেম এর উদ্দেশ পাওয়া যায়। একে হারেম, হারিম হিসাবেও উচ্চারিত হতে লক্ষ করা যায় ক্ষেত্র বিশেষ পূর্বে একে মহল (মহিলারা থাকে বলে) বলা হতো। হেরেমে বহিরাগতদের প্রবেশাধিকার ছিল না স্বভাবতই হেরেমে বিলাসবহুল অভিজাত জীবনযাপনের ব্যবস্থা ছিল নয়নাভিরাম এবং জাঁকজমকপূর্ণ এই মহল বা হেরেমকে নিরাপত্তা বিধানের জন্য ভেতর মহলে নিয়োজিত থাকতেন বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পন্ন নারীগণ। এদের থেকে দূরে বাইরে নিয়োজিত থাকতেন খোজ বা নপুংশক পুরুষেরা। এবং তাদের থেকে দূরে থাকতেন পরীক্ষিত অনুগত সৈন্যসদস্যরা।

রাজ-রাজারা, জমিদারেরা সাধারণত সপ্তাহে তিনদিন (শনি, রবিও মঙ্গলবার) হেরেমে যেতেন। ঝর্নাপ্রসবিত বাগানঘেরা স্বগোংপথ সেই বিশ্রামস্থলে ঘুরে বেড়াতেন এবং নির্দষ্ট বা ইচ্ছে মতো পত্নির সঙ্গ উপভোগ করতেন। এক্ষেত্রে স্বভাবতই পত্নীদের প্রচেষ্টা থাকতো রাজ-রাজারা বা জমিদারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার।

BanglaBook.org

এই রকমের আকর্ষণ ও কাম আবেদন সৃষ্টির চেষ্টায় উপপত্নীগণও কম যেতেন না।

এই যে হেরেমে উপপত্নীগণও থাকতেন এই বিষয়টিই বাইজি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত। এখানে রাজকী ফুর্তি আমাদের নিমিত্ত নাচ গানের ব্যবস্থা হতো সেখানে আগত নর্তকীরা কেউ কেউ উপপত্নীর মর্যাদা দখল করে বসতেন। এদের কেউ কেউ এমনকি প্রকৃত স্ত্রী রানি বেগমের স্থানে অভিষিক্ত হয়ে যেতেন।

ব্যতিক্রমও ছিল। সেসব রাজ রাজাদের নারী এবং সবার প্রতি আসক্তি ছিল না। তারা বিজীতদের নারীগণকে হেরেমে আশ্রয় দিতেন এবং মানবিক আচরণ করতেন। এতদঞ্চলের রাজনীতিতে যেসব প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস রয়েছে তার অনেক ক্ষেত্রেই এই হেরেমের সম্পৃক্ততা অনস্বীকার্য। এইসব অনাকাঙ্ক্ষিত সমস্যা রুখে দেয়ার জন্যই বাংলার স্বাধীন নবাবগণ মুঘল প্রশাসনের কৌশলানুসারী হয়ে তাদের রাজত্বেও হেরেম প্রথার প্রবর্তন করেন। এবং সেখানে গুপ্তচর কর্মচারী রিপোর্ট প্রাত্যহিক প্রতিবেদন, নজরদারী, সূর্যাস্তনিয়ম ইত্যাদি প্রশাসনিক কড়াকড়ি কায়েম করা হয়েছিল।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

ঢাকার বাইজি

আনিস আহামেদ

সামন্তবাদী ব্যবস্থায় পুরুষদের মনোরঞ্জনে নারীদের ব্যবহার ও অংশগ্রহণ সমাজসিদ্ধ ছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকার প্রথম সুবেদার ইসলাম খাঁ তার শাসনামলে ১২০০ নর্তকী ঢাকায় নিয়ে আসেন। আমোদ-প্রমোদ মুঘল আমলে পশ্চিমা অভিজাত আর সৈন্য-সামন্তদের একচেটিয়া বিষয় ছিল। ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদ বদলি হলে মূলত ঢাকা একটি প্রমোদনগরীতে রূপান্তরিত হয়। বাংলার ধনাঢ্য আয়েশী ব্যবসায়ী, জমিদার নবাব সাহেবরা ঢাকাকে আমুদে নগরীতে পরিণত করে। সারা ভারতের হিন্দু-মুসলিম নর্তকী, তাওয়ায়েফ, বেশ্যা, মিরাশীদের পদভারে ঢাকা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

কোম্পানি ও ব্রিটিশ আমলে ঢাকার ধনাঢ্য জমিদার আর ব্যবসায়ীরা এখানে-সেখানে রংমহল, বাগানবাড়ি গড়ে তোলে। সে সময় বাবুবাজার থেকে সদরঘাট পর্যন্ত শতাধিক বেশ্যালয়, বাইজি-খানা গড়ে ওঠে।

BanglaBook.org

নওয়াবিন বাইজি

ফি বছর বাংলার বিভিন্ন স্থানে খাদ্যাভাব আর দুর্ভিক্ষের কষাঘাতে জর্জরিত বিত্তহীন মহিলাদের দেহ বিক্রি করে জীবনযাপন করতে হয়। সে সময়ের ওপর ভিত্তি করে ইতিহাস, আত্মজীবনী, সফরনামা পুস্তক ও প্রবন্ধে এ বিষয়গুলো খোলাখুলিভাবে বিবৃত হয়েছে।

রূপজীবী ও মহিলাদের অনেকেই বিপুল ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিল। তাদের অনেকেই সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ প্রমাণ রেখেছেন। এর মধ্যে রাজলক্ষ্মী বাই ইসলামপুরের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত কালিমন্দির পুনর্নির্মাণ করে দিয়েছিল। নসিবুন বাইজি সিদ্দিকবাজারে একটি পুকুর খনন করেছিল বলে জনশ্রুতি রয়েছে। এ পুকুরটি 'নসিবুন বাইজির পুকুর' নামে পরিচিত ছিল। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে লালবাগের প্রাচীন শ্মশান ঘাটটির বাউন্ডারি দেয়াল, পাণ্ডাদের ঘর ও মন্দির নির্মাণ করে দেন এক অজ্ঞাত পরিচয় বাইজি।

তাওয়ায়েফদের নৃত্যগীত

ইবনে বতুতা যখন বাংলা সফর করেন সেটি ছিল তুর্কি যুগ। সোনারগাঁ ছিল সে আমলের সমৃদ্ধ নগরী। ঢাকা ছিল এর পার্শ্ববর্তী বাজার নগরী। তিনি বর্ণনা করেছেন, 'বাংলায় এত সুলভে পরিচারিকা পাওয়া যায়, যারা ভালো ফারসি গজল গাইতে জানে।' স্বভাবতই সাধারণ বাঙালি ললনাদের পক্ষে তো বাংলায় সঙ্গীত চর্চা করার কথা। সেখানে যারা ইবনে বতুতাকে ফারসি গজল শুনিয়েছেন, নিঃসন্দেহে সেসব ললনা ছিল রাজাশ্রিত পেশাদার শিল্পী।

কারণ তখনকার রাজভাষাও ছিল ফারসি। আর ঢাকার প্রথম সুবেদার ইসলাম খাঁ-এর মাত্র পাঁচ বছর বয়সি শাসনামলে দরবারে মনোরঞ্জনের জন্য নাচনে-গানেওয়ালী কাঞ্চনী বা সেবিকার সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২০০। এই সেবাদাসীদের পেছনে সুবেদার মহাশয় শুধু রাজকোষ থেকেই খরচ করেছিলেন ৮০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেয়া যায় মুঘল ঢাকায় জৌলুস বাড়ার সাথে সাথে এসব তাওয়ায়েফ তথা নর্তকিদের আধিপত্যও বাড়তে থাকে।

BanglaBook.org

মুঘল ঘরানার ঢাকাইয়া সোববাস সমাজ ব্যবস্থায় তাওয়ায়েফদের নৃত্যগীত স্থানীয় সংস্কৃতির অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে। এ সংস্কৃতি একাধারে ৩০০ বছরের অধিককাল ঢাকায় দাপটের সাথে বিদ্যমান ছিল। সুরের মূর্ছনা, নূপুরের ঝঙ্কার আর তবলার বোলতালে তখনকার সোববাস ঢাকাইয়ারা আকণ্ঠ ডুবে ছিল। নৃত্য ও গীত চর্চায় ঢাকা একসময় দিল্লি, লাখনো, লাহোর, হায়দ্রাবাদকেও ছাড়িয়ে যায়।

ঢাকার নবাব আব্দুল গনির সকালের চায়ের আসরে ঢাকার অভিজাতরা জমা হতেন। রাইসরা বড় টেবিলের চারদিকে গোল হয়ে বসত, টেবিলের ওপর নামকরা তাওয়ায়েফরা হাজির হতো। তারা শ্রোতামণ্ডলীর মনোরঞ্জন করত। এসব তাওয়ায়েফদের নবাববাড়ি থেকে মাসিক ভাতা পাঠানো হতো। নবাব আব্দুল গনির আমলে তাওয়ায়েফদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল– আন্নু, গান্নু ও নোয়াবিন নামের তিন বোন। এলাহিজান, পেয়ারী বেগম, আচ্ছি বেগম, ওয়াসু, বাতানি, জামারবাত, হীরা, ইমামী, অতুল বাঈ, লক্ষ্মী বাঈ, রাজলক্ষ্মী– এসব প্রসিদ্ধ তাওয়ায়েফরা ঢাকায় বেশ ধন-সম্পদের মালিক হয়েছিল।

এছাড়া স্থানীয় বাইজিরা খেমটা নাচে পারদর্শী ছিল। নবাব আব্দুল গনির নবাবী খেতাব পাওয়া উপলক্ষে ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দের পর প্রতি বছর ১ জানুয়ারি শাহবাগে ঢাকাইয়া সোববাসদের সার্বজনীন উৎসব হতো। নয়নাভিরাম শাহবাগের চত্বরসমূহে ভিন্ন ভিন্ন সামিয়ানার নিচে তাওয়ায়েফরা আসর জমাত। দর্শকরা তাদের নাচ দেখে ও গান শুনে মনোরঞ্জন করত। এমনই এক উৎসবে শাহবাগের গোলতালাবের (পুকুর) ওপর স্থাপিত লোহার স্টেজ ভেঙে তাওয়ায়েফদের নৃত্য দর্শনকারী অনেকে আহত হয়েছিল।

BanglaBook.org

ঢাকার বাইজি উপাখ্যান

গোলাম কাদের

মানব সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষের মনের খোরাক জোগানোর নানা কলাকৌশল প্রচলন হয়ে আসছে। চিত্তবিনোদনের এ ধারায় বাদ্য, নৃত্য গীত মানুষের মনে রসের সঞ্চারে সহায়তা করে আসছে। আর এ জন্যে যুগেযুগে সঙ্গীত, নৃত্য পটিয়সীদের সমাজে কদর ছিল।

ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে 'বাই' শব্দ দ্বারা ধ্রুপদী নৃত্য-গীতে পারদর্শী সম্ভ্রান্ত মহিলাদের বোঝানো হত খুব ছোট থাকতেই তারা ওস্তাদদের কাছে তালিম নিয়ে নৃত্যগীত শিখতেন শিক্ষা শেষে শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতকে পেশা হিসেবে নিলে লোকে তাদের 'বাই' শব্দটির সম্মানসূচক 'জি' শব্দটি জুড়ে দিত, তখন তাদের নামে শেষে 'বাইজি' শব্দটি শোভা পেত বাইজিরা সম্রাট, সুলতান, বাদশা, রাজা-নবাব, ধনাঢ্যব্যক্তি ও জমিদারদের রঙমহলে শাস্ত্রীয় নৃত্যগীত পরিবেশন করে বিপুল অর্থ ও খ্যাতিলাভ

BanglaBook.org

দেবদাসীদের নৃত্য

করতেন অর্থ আয়ের জন্য তারা যেমন বাইরে গিয়ে 'মুজরো' নাচতেন, তেমনি নিজেদের ঘরেও মাহফিল বসাতেন। সেই মাহফিলে উচ্চবিত্তের লোকজনেরা স্থান পেত।

খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলায়, বিশেষ করে কলকাতায় বাইজিদের আগমন ঘটতে থাকে। অযোধ্যায় বিতাড়িত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহর কলকাতার মেটিয়া বুরুজ এলাকায় নির্বাসিত জীবনযাপনকালে সেখানে যে সংগীত সভার পত্তন ঘটে, তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক বাইজির আগমন ঘটে। বেশির ভাগ বাইজিই রাগসংগীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্য বিশেষত কত্থকে উচ্চশিক্ষা নিতেন। বাইজিদের নাচ-গানের আসরকে মুজরো বলা হয়, আবার তাকে মেহফিল বা মাহফেলও বলা হয়ে থাকে। মেহফিলে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অংশগ্রহণ ছাড়াও কোনো কোনো বাইজি রাজা-মহারাজা-নবাবদের দরবার থেকে নিয়মিত মাসিক বেতন পেতেন। বাইজিদের নাচ-গানে মোহগ্রস্ত হওয়ার কারণে কোনো কোনো নবাব-রাজা-মহারাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তির পারিবারিক ও আর্থিক জীবনে বিপর্যয়েরও সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা, ভারতের ইতিহাস ঘাটলে প্রমাণ মিলে এরকম।

ঢাকায় বাইজিদের নাচ-গান শুরু হয় মুঘল আমলে। সুবাহদার ইসলাম খাঁর দরবারে (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব) যারা নাচ-গান করতেন তাদের 'কাঞ্চনী' বলা হতো। উনিশ শতকে ঢাকার নবাব নুসরাত জং, নবাব শামসুদ্দৌলা, নবাব কমরুদ্দৌলা এবং নবাব আবদুল গণি ও নবাব আহসানুল্লাহর সময় বাইজিদের নাচ-গান তথা মেহফিল অন্যমাত্রায় উঠে আসে। তারা আহসান মঞ্জিলের রংমহল, শাহবাগের ইশরাত মঞ্জিল, দিলকুশার বাগানবাড়িতে নৃত্য-গীত পরিবেশন করতেন। ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব বাইজি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাদের মধ্যে লক্ষ্ণৌর প্রখ্যাত গায়ক ও তবলাবাদক মিঠন খানের নাতি সাখান খানের স্ত্রী সুপনজান উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকায় ছিলেন।

১৮৭০ এর দশকে ঢাকার শাহবাগে নবাব গণির এক অনুষ্ঠানে মুশতারী বাই সংগীত পরিবেশন করে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবদুল

BanglaBook.org

গফুর খানের নজরে পড়েছিলেন। ১৮৮০ এর দশকে শাহবাগে এলাহীজান নামে আরেক বাইজির নৃত্য ও করুণ পরিণতির দৃশ্য দেখেছিলেন হাকিম হাবিবুর রহমান। নবাব গণির দরবারে নাচ-গান করতেন পিয়ারী বাই, হীরা বাই, ওয়ামু বাই, আবেদী বাই, আন্নু, নান্নু ও নওয়াবীন বাই।

শেষোক্ত তিন বোন ১৮৮০ এর দশকে ঢাকার নাটক মঞ্চায়নের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ঢাকার অন্য খ্যাতিমান বাইজিদের মধ্যে ছিলেন বাতানী, জামুরাদ, পান্না, হিমানী, আমিরজান, রাজলক্ষ্মী, কানী, আবছন প্রমুখ। এছাড়া কলকাতা থেকে মাঝেমধ্যে ঢাকায় মুজরো নিয়ে আসতেন মালকাজান বুলবুলি, মালকাজান আগর-ওয়ালী, জানকী বাই, গহরজান, জদ্দন বাই, হরিমতী আরও অনেকে।

নাচ গান ও রূপের নেশায় উচ্চমান অর্জন হলেও কোনো পুরুষ শিল্পী কিন্তু এই সব বাইজির সঙ্গে এক আসরে বসতে চাইতেন না। কলকাতার একটি আসরে মুশতারী বাই পূরবী রাগে খেয়াল গেয়ে সুরের মদিরায় শ্রোতাদের এমন আচ্ছন্ন করেছিলেন যে ওই আসরে পরবর্তী শিল্পী বিখ্যাত কৈঁয়াজ খা, এনায়েত খা ও হাফেয খা মঞ্চে উঠতেই অস্বীকৃতি জানান।

ইন্দোররাজ শিবাজী হোলকারের সভায় বিখ্যাত বীনাকার স্বয়ং বন্দে আলী খা। বীনা বাজিয়ে সুরের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ করেন সব শ্রোতাদের, শিবাজীর খাস নর্তকী চুন্নাবাই কিন্তু ছিলেন সেদিন মুগ্ধ শ্রোতাদের আসরে। খুশী হয়ে রাজা ইনাম দিতে চেয়েছিলেন বীনাকারকে। সুরমুগ্ধ রাজাকে চমকে দিয়ে বন্দে আলী খা ইনাম হিসাবে চেয়ে বসলেন বাইজি চুন্নাবাইকে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় নিকি বাই, আশরুন জিনাত, বেগমজান, হিঙ্গল বাই, নান্নিজান বাই ও সুপনজান বাইয়ের নাম শোনা যায়। হেকিম হাবিবুর রহমান তার লেখায় অনেক বাইজির নাম বলেছেন যেমন- আবেদি বাই, আন্নু, নান্নু, নোয়াবীন, পিয়ারী বেগম, আচ্ছি বাই, ওয়াসু, বাতানী, হীরা, লক্ষ্মী, জামুরাদ,

BanglaBook.org

রাজলক্ষ্মী, এ ছাড়া সত্যেন সেনের লেখা থেকে জানকী বাই ও মালেকাজানের নাম জানা যায়।

বিখ্যাত গহরজান, জদ্দন বাই ও মুশতারী বাই ঢাকায় মেহফিল অংশ নিয়েছিলেন। এ ছাড়া বিখ্যাত জিন্দাবাহার লেনের দেবী বাইজি ও হরিমতি বাইজির নাম ও উল্লেখ্য করতে হয়। ঢাকার জিন্দাবাহার লেনের বাসিন্দা বিখ্যাত শিল্পী পরিতোষ সেনের লেখায় হরিমতি বাইজির কথা আছে। তিনি লিখেছেন–হরিমতি বাইজির ঘর টি আমাদের বারান্দা থেকে পরিস্কার দেখা যায়, প্রতিদিনের অভ্যাস মত সকালে ভৈরবী রাগে গান ধরেছেন–'রসিয়া তোরি আখিয়ারে, জিয়া লাল চায়' ঠুংরী ঠাটের গানের এ কলিতে আমাদের জিন্দা বাহার গলি কানায় কানায় ভরে উঠতো।

সেকালে ঢাকার গানের আসরে ছিল সব সমঝদার শ্রোতার আগমন, ইন্দুবালার একটি মন্তব্য থেকে এ ব্যাপারে ধারনা পাওয়া যায়, কলকাতা থেকে ঢাকা আসার আগে সে কালী ঘাটে যেয়ে মন্দিরে প্রার্থনা করেছিল, মা ঢাকা যাচ্ছি, ঢাকা তালের দেশ, মান রাখিস মা'। ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল ডেভিডসন ১৮৪০ সালে ঢাকার অধিবাসীদের 'মিউজিক্যাল পিপল' বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

বাইজি নাচ ও খেমটা নাচ সেকালে ঢাকার মানুষদের জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবি নবীন চন্দ্র সেন তার ছেলের বিয়েতে ঢাকা থেকে বাইজি আনতে পেরে গর্ব অনুভব করেছিলেন। গান আর নাচে খুব দক্ষ না হলে সে কালে ভাল বাইজি হওয়া যেত না আর তার সঙ্গে অবশ্যই থাকতে হত রূপের মোহ।

একবার খেতরীর রাজার সভায় উপস্থিত হন স্বয়ং বিবেকানন্দ। সভায় একজন বাইজি গান গাইবেন, একেতো স্ত্রীলোক তা আবার বাইজি, বিবেকানন্দ গান শুনতে অস্বীকৃতি জানাল, কিন্তু রাজার অনুরোধে গান শুনতে বসলেন। বাইজি গাইলেন–

প্রভু মোর অবগুন চিতনা ধর
সমদরশি হ্যায় নাম তোমার
এক লহো পুজামে রহত হ্যায়

BanglaBook.org

এক রহো ঘর ব্যাধক পরো
পরলোক মন দ্বিধা নাহি হ্যায়
দুই কাঞ্চন করো।

গান শুনে বিবেকানন্দের চোখে পানি চলে আসে। এরপর সেই বাইকে বিবেকানন্দ মা বলে সম্বোধন করেন। যারা মানুষের আনন্দের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিতেন সমাজ তাদের দিত নিত্য বঞ্চনা।

মুশতারী বাই শুধু সুরের জাদুতে বশ করতেন শ্রোতাদের। ১৮৭০ সালে ঢাকার নবাব আব্দুল গনির আমন্ত্রণে শাহবাগের বাগান বাড়িতে এসে গান গেয়ে মুগ্ধ করেছিলেন সেকালের বিখ্যাত উর্দু সাহিত্যিক আবদুল গাফফার নাসকান কে। কলকাতায় তার গান শুনে আত্মহারা হয়েছিলেন রাঁইচাদ বড়াল, কৃষ্ণচন্দ্র আর কবি নজরুল ইসলাম। রেডিওতে মুশতারী বাইয়ের গান শুনে তখন ফোন করছিলেন রেডিও অফিসে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই দেবীকে কোন গন্ধর্বলোক থেকে নিয়ে এলে'?

লাল চাদ বড়ালের গুরু বিশ্বনাথ রাওয়ের ছাত্রী মানদা। ল্যান্স ডাউন রোডে নাটোর হাউসে বিখ্যাত ফৈয়াজ খাঁর সঙ্গে এক সঙ্গে সংগীত পরিবেশন করেছিলেন ১৯২৭ সালে যা এর আগে কল্পনাই করা যেত না। এভাবেই সমাজের কাছে নিস্প্রভ করে দিয়েছিলেন গনিকার আত্মজা হওয়ার কষ্ট। মানদার ৫০ টির মতো রেকর্ড আছে তার মধ্যে ৩ টি রবীন্দ্র সংগীত। উপমহাদেশে পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নারী শিল্পীদের চলা এই সময় থেকেই মূলত শুরু।

ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বাইজি বা বারাঙ্গনা পাড়া ছিল। সে সময় বাইজি পাড়া হিসাবে গঙ্গাজলি ও সাচিবন্দর ছিল। ঢাকার ইসলাম পুর ও পাটুয়াটুলীর মোড় থেকে যে পথটি ওয়াইজঘাট নামে বুড়ি গঙ্গার দিকে চলে গেছে তার নাম ছিল গঙ্গাজলি। সন্ধ্যা নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তবলার বোল, সেতারের ঝঙ্কার আর নুপুরের নিক্কর গঙ্গাজলির পরিবিশ মুখরিত হয়ে উঠত। বাবু আর সাহেবদের আলবোলার গড়গড় শব্দ পরিবেশের সঙ্গে ছিল সঙ্গতি পূর্ন।

BanglaBook.org

নাট্যকার সাঈদ আহমেদ তার একটি লেখায় বলেছেন, কাছেই ছিল মহেশ ভট্টাচায্যির বিশাল হোমিওপ্যাথিক ওষুধের দোকান, গঙ্গাজলির উল্টো দিকে ছিল কালীমন্দির। গঙ্গাজলি ছিল দোতালা প্রসস্ত বাড়ি। নীচতলায় বাইজিদের কাজের লোকেরা থাকত। বাইজিরা থাকতেন দোতালায়। বাকওয়ালা সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হতো। বারান্দায় পাতা থাকত ইজি চেয়ার। বাইজিদের খাস কামরা সাজানো থাকত শান শওকতে। ফরাশ বিছানো ঘর।

গঙ্গাজলির অধিকাংশ বাইজি বিষ্ণু উপাসনা করত। প্রতিদিন সকালে গঙ্গাজলি থেকে স্নানের জন্য দল বেধে বুড়ি গঙ্গায় যেতেন। গোসল সেরে বুকে গামছা জড়িয়ে কোমরে পিতলের কলসি নিয়ে সিক্ত ভূষনে বাইজিরা লাইন দিয়ে ফিরে আসতেন। এ দৃশ্য উপভোগ করতে কৈশরে বন্ধুদের নিয়ে ওয়াইজ ঘাট এলাকায় যেতেন নাট্যকার সাঈদ আহমেদ।

শিল্পী পরিতোষ সেন ও কিন্তু ভূলে যাননি সিক্ত বসনে বাইজিদের ঘরে ফেরার দৃশ্যর বর্ণনা দিতে:

'আমাদের পাড়ায় বারবনিতারা প্রতিদিন সকালে স্নান করতে বুড়িগঙ্গা যায়। তাদের স্নানে যাবার পথটি আমাদের বাসার সামনে দিয়ে। ফেরার পথে ভেজা কাপড়ে কালী মন্দিরে প্রণাম করে আমাদের গলির মুখে আবার দেখা হয়। সকাল বেলার এই মনোরম দৃশ্যটি আমাদের পাড়ার পুরুষদের চোখকে বেশ তৃপ্তি দিত। তাদের মন মেঝাজ খোশ রাখে। দিনটি ভালো কাটে।

সদ্য স্নাত তরুণীদের প্রথম সারির মাঝখানে ১৬-১৭ বছরের একটি মেয়ের আকর্ষণীয় বর্ণনা দিয়েছিলেন পরিতোষ সেন। 'মুখটি অবিকল লিচুর মত গোল। থুতুনিটি ঈষৎ তীক্ষ্ণ, ঠোঁট দুটি যেন রসালো দুটি কমলার কোয়া। তার নাকের ছোট্ট পাটা দুটি প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ফুলে উঠছিল। গোটা শরীরটি যেন মুর্শিদাবাদী রেশম দিয়ে মোড়ান। এমনই মসৃন তার চকচকে তার ত্বক। পাকা পাতিলেবুর গায়ে হাল্কা গোলাপী রঙের পোচে যে রঙের মিশ্রন হয় ঠিক তেমনই তার গায়ের রঙটি। তার নীল কালো চোখ দুটি যেন স্তম্ভিত মেঘ মুখের অর্ধেকটাই জুড়ে আছে।

BanglaBook.org

শাস্ত্রে বলা আছে বিহঙ্গের সৌন্দর্য্যের প্রতি আনুরাগ আছে বলিয়াই তো বিহঙ্গটি সুন্দর হয়েছে। ময়ুর ও সেই সৌন্দর্য্যের প্রতি অনুরাগী বলিয়াই তো ময়ুর সুন্দর হয়েছে। চম্পক আঙ্গুলী ও খঞ্জন নয়নের প্রতি পুরুষের আকর্ষন আছে বলিয়াই তো নারী জাতি চম্পক আঙ্গুলী ও খঞ্জন নয়নের অধিকারিনী হয়েছে'।

পরিতোষ সেন আরো বর্ণনা দিয়েছেন–

'ভেজা কাপড়টি মেয়েটির গায়ে লেপ্টে থাকার কারণে তার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যেন একটি ফুলের বিভিন্ন পাপড়ির মতো আলাদা সত্তা নিয়ে সরল বৃন্তটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এক একটি পাপড়ি যেন একেকটি ফুল। বাকী মেয়েকটির মতো তার কাঁধেও পেতলের কলসি ভরা বুড়িগঙ্গার জল। এই কলসি আর নিতম্ব দুইই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। দুইই টলোমলো। এমনই সুন্দর সাবলীল আর বেপরোয়া।

তার চলার ভঙ্গি মনে হয় কোন নিঃশব্দ সংগীতের সঙ্গে তাল রেখে পা ফেলছে বা এই পা ফেলের ঢং যে কোন ওস্তাদ নর্তক বা নর্তকীর ঈর্ষার বস্তু হতে পারে, তাতে আর সন্দেহ কি? এই চালে তার সোনার বাটির মতো বক্ষ যুগল নেচে উঠছে, আর একটু নাচলেই হয়ত করতালের মতো বেজে উঠবে।

যে মেয়ের উদ্ভাসিত রূপ পৃথিবীর তাবৎ পুরুষদের সমস্ত সূর্যকিরনকে সজীব করে তোলে তার কোথা থেকেই বা শেষ করি কোথা থেকেই বা শুরু করি? একই দেহে একই সঙ্গে এত রূপ দেখার পক্ষে বিধাতা পুরুষদের দুটি মাত্র চোখ দিয়ে যেন বিশেষ অবিচার করেছেন, কারণ একদিক দিয়ে দেখতে গিয়ে আর একদিক যেন বাদ পরে যায়।

তাই এক কথায় বলি এ যুগের রাধা। তার মা যাকি তাকে সত্যি সত্যি হরিদাসী বলে ডাকত। জমিদার পুত্র, বিশ্ববিখ্যাত সাতারু, আধুনিক বাংলা সাহিত্য বিশেষ অবদান রয়েছে এমন লেখক আর কবিদের হরিদাসীর দাস হতে দেখেছি'।

BanglaBook.org

সত্যেন সেন তার রচনায় ঢাকার জানকী বাইয়ের কথা বলেছেন। এলাহাবাদের মেয়ে ছিলেন। থাকতেন ঢাকায়। সে সময় তিনিই ঢাকায় সবচেয়ে বেশি পারিশ্রমিক প্রাপ্ত ছিলেন একদিনের মুজরোতে তাকে দেড় হাজার টাকা দিতে হত ততকালীন সময়ে। জানকী ছিলেন এক নবাবের রক্ষিতা। নবাব তাতে এতই মুগ্ধ ছিলেন কেউ যেন তার কাছ থেকে জানকীকে ছিনিয়ে নিতে না পারে সেই জন্য কিছুটা কুৎসিত করার নিমিত্তে জানকীকে ৫৬ টি ছুরির আঘাত করেছিলেন। সে কারনে জানকী ছাপান্ন ছুড়ি নামে পরিচিত ছিল।

ঢাকার বাইজিদের নিয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায় হেকিম হাবিবুর রহমানের লেখায়। এলাহীজান উত্তর ভারত থেকে ঢাকায় এসেছিলেন। নওয়াব আবদুল গনির কাছ থেকে তিনি নিয়মিত মাসোহারা পেতেন। নবাব সাহেবের কাছ থেকে আরো অনেকে মাসোহারা পেতেন যাদের কথাও হেকিম সাহেব তার লেখায় উল্লেখ্য করেছেন। আন্নু, গান্নু আর নওয়াবীন ছিলেন তিন বোন। এদের মধ্যে সবচেয়ে ডাকসাইটে ছিলেন নওয়াবীন।

এই তিন বোন ১৮৮০ সালে নভেম্বরে 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভাড়া করে টিকিট বিক্রির মাধ্যমে 'ইন্দ্রসভা' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন। ঢাকা প্রাকাশ এর সংবাদ অনুযায়ী মঞ্চস্থ নাটকটিতে শুধু বাইজিদের অংশ গ্রহণের কারণে অনেকেই এর বিরোধিতা করেন। ঘটনাটি আমাদের মঞ্চ নাটকের জন্য ও খুব গুরুত্বপূর্ন কারণ ঢাকায় শুধু মহিলাদের উদ্দ্যেগে মঞ্চনাটক এই প্রথম। ইন্দ্রসভা ছাড়া তারা 'যাদুনগর' নামে আর একটি নাটক মঞ্চস্থ করে।

হেকিম হাবিবুর রহমান তার লেখায় আচ্ছি বাইকে নবাব সাহেবের সব থেকে পেয়ারী বাইজি বলে উল্লেখ করেন। লক্ষ্মৌর এই বাইজি ছিলেন নৃত্যে সুনিপুনা। হেকিম সাহেবের মতে ঢাকায় এরপরে এত বড় মাপের আর কোনো নর্তকী আসেনি। হীরা বাইজি নাকি নাচে খুব দক্ষ ছিলেন, হীরা বাইজি যখন নাচতেন তখন তার গায়ের কালো রঙ থেকে নাকি আলো ঠিকরে পড়ত। হীরা বাইজির মেয়ে পান্না কিন্তু গজল গেয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

BanglaBook.org

আমীরজান বাইজি আর রাজলক্ষী বাইজির কথা লিখতে গেলে ঢাকার পানীয় জল সরবরাহের কথা লিখতে হয়। ১৮৭০ এর দশকে ঢাকায় পানিয় জল সরবরাহের নিমিত্তে নবাব আবদুল গনি গণ্যমান্যদের নিয়ে একটি সভা ডাকেন। আমন্ত্রণ জানানো হয় রাজলক্ষ্মী আর আমীরজানকে। সে সভায় সব বড় বড় জমিদারদের আহ্বান জানান সবাই যেন কিছু কিছু দিয়ে সাহায্য করে।

ওই বৈঠকে আমীরজান আর রাজলক্ষী টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছিল আর কোন নবাব বা জমিদার কিন্তু কোন সাহায্য প্রস্তাব দেয়নি। নবাব গনি সে সাহায্য না নিয়ে পুরো প্রকল্পের ব্যায়ভার নিজের কাধে তুলে নেন। রাজলক্ষী ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত জিন্দাবাহার গলির মুখে কালী মন্দির সংস্কার করেছিলেন।

সত্যেন সেনের লেখায় মালকাজান সম্পর্কে জানা যায়। মালকাজান মুজরো করতে ঢাকা আসতেন। সে সময় তিনজন মালকাজান ছিলেন। আগ্রাওয়ালী মালকাজান, বেনারসের চুলবুলিয়া মালকাজান ও ভাগলপুরী মালকাজান, উপমহাদেশের বিখ্যাত বাইজি গওহরজান ছিলেন বেনারসের চুলবুলিয়া বা বড় মালকাজানের কন্যা। অসামান্য রূপসী মালকাজানের পূর্ব নাম ছিল লেডী এডেলাইন। আর্মেনিয়ান ইহুদি। স্বামী রবার্ট ইউয়াডের সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে পরে এডেলাইন বাইজি বৃত্তি গ্রহন করে।

এরপর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজের নাম রাখেন মালকাজান আর মেয়ে এঞ্জেলিনার নাম রাখেন গওহরজান। আধুনিক নায়িকাদের মতো সেকালে মালকাজানের ছবি অধিকাংশ ঘরেই টানান থাকত, এত ছিল তার রূপ। মালকাজানের কিছু রেকর্ড বের হয়ে ছিল। ভারতের বাইজি মহলে গওহরজান কিন্তু সম্রাজ্ঞীর আসন করেছিলেন। একে ছিলেন অসামান্য সুন্দরী তায় গুণী শিল্পী। ১৯০২ সালে তার গাওয়া গানের রেকর্ড বের হয়।

সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর ১৮৯০ এর দশকে ঢাকার কালীবাড়ির এক বিয়েতে তাকে নাচতে আর গাইতে দেখেছেন।

BanglaBook.org

গওহরজান ছিলেন ভীষণ শৌখিন আর ফ্যাশন সচেতন। নিজেকে সব সময়ই সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করতেন। বস্তুত গওহরজানের হাত ধরেই কিন্তু শিল্পীদের ফ্যাশন সচেতনতা এ দেশে শুরু হয়। তার গানের রেকর্ড ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। তিনি কিছু করেছিলেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের গানের গুরু ওস্তাদ জমির উদ্দিন কিন্তু গওহর জানের শিষ্য ছিল।

গওহরজানের মা মালকাজানের সৎবোন ছিল জদ্দন বাই। জদ্দনের মা ইসলাম গ্রহণ করে আর জীবিকার কারণে মেয়েকে বাই হিসাবে তৈরি করে। জদ্দন বাই বেশ কয়েক বার বিয়ে করেন। জদ্দন বাই ঢাকার বিভিন্ন মেহফিল মাতিয়ে রাখতেন। তিনি ঢাকার নবাব এর ঘনিষ্ট সান্নিধ্য পেয়েছিলেন বলেও জানা যায়। জদ্দনের শেষ স্বামী উত্তম চাদ মোহন জদ্দনের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে মুসলমান হন আর তাকে বিয়ে করেন। মোহন নিজের নাম রাখেন আবদুর রশীদ।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ এ বিয়েতে সাক্ষী হন। জদ্দন বাইজি পেশা ছেড়ে চলচিত্রের সঙ্গে যুক্ত হন। রশীদ আর জদ্দানের ঘরে জন্ম নেন নার্গিস। এই সেই নার্গিস ভারতের চিত্র জগতে তিনি কিংবদন্তী তুল্য মর্যাদা পেয়েছেন। সে যুগের সেই সব বাইজিরা কিন্তু শিক্ষিত নারীদের চলচ্চিত্রে আসার পথ খুলে দিয়েছিলেন। বলা যায় বাইজিদের ঘর থেকেই মেয়েরা প্রথম অভিনয়ের পথে আসেন। আর বাইজিদের ঘর থেকেই নার্গিসের মত চলচ্চিত্র শিল্পী বেরিয়ে আসে

১৮৭৩ সালে কলকাতার মেয়েরা যখন যখন রঙ্গমঞ্চে আসার অনুমতি পেলেন, তখন নিষিদ্ধ পল্লীর সংগীতে পারদর্শীরাই কিন্তু মঞ্চে এসেছিল। তখন থেকে বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশক পর্যন্ত কিন্তু সমস্ত অভিনেত্রীরাই সুগায়িকা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী থেকে বিংশ শতাব্দীর আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা পর্যন্ত অনেকেরই নাম করা যায়।

ঢাকার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক চলচিত্র ছিল 'দ্য লাষ্ট কিস' এর নায়িকা ছিল লোলিতা তাকে বাদামতলীর নিষিদ্ধ পল্লী থেকে নিয়ে আসা হয়। তার আসল নাম ছিল বুড়ি। তখন তার বয়স ছিল মাত্র

BanglaBook.org

১৪ বছর। ছবির কাজ শেষে বুড়ি আবার পুরনো পেশায় ফিরে যায় এর বেশি কিন্তু লোলিতার সম্পর্কে জানা যায় না। মঞ্চে তাদের অভিনয় করানোর জন্য অনেক পত্র পত্রিকায় জোর প্রতিবাদ জানানো হয়। তাদের সঙ্গে যে এক মঞ্চে উপবেশন করাই অসম্মানের। দ্যা লাষ্ট কিসের সহনায়িকা চারুবালাকে আনা হয় কুমারটুলী পতিতালয় থেকে জিন্দাবাহার লেন থেকে আনা হয় দেববালাকে।

এখন সেই সময় নেই। সেই বাইজি নেই। রংমহল নেই। রংমহলের সেই সম্মানীত বাইরাই বাইজি হতে হতে একসময় জিন্দাবাহার, কুমারটুলির পতিতালয়ে জায়গা করে নেয়। বাইজিরা একসময় হারিয়ে যায়। নৃত্য-গীত হীন শুধুই পতিতালয়গুলো একসময় রাজনৈতিক এবং সামাজিক চাপে উঠিয়ে দেয়া হয়। এখন সময়ের দাবীর প্রেক্ষিতে লোক চক্ষুর আড়ালে অনেক বিত্তবান, ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ফ্ল্যাট কিনে, সেখানে রেখে অনেক হরিদাসি পালন করছেন। শুধু দেহ ভোগের জন্য। সেখানে না আছে সঙ্গীত, না আছে নৃত্য। রসহীন ভোগ-বিলাস আর শুধুই যাতনা।

তথ্যসূত্রঃ হেকিম হাবিবুর রহমান, শিল্পী পরিতোষ সেন, সত্যেন সেন, ড. মুনতাসির মামুন, শামীম আমিনুর রহমান, স্বপন দাস, ইন্টারনেট

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

‘দ্য লাস্ট কিস’ ঢাকার প্রথম নির্বাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

অনুপম হায়াৎ

নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানি গঠিত হয়। এর প্রযোজনায় অম্বুজপ্রসন্ন গুপ্ত নির্মাণ করেন নির্বাক পূর্ণদৈর্ঘ চলচ্চিত্র দ্য লাস্ট কিস। খাজা আজমল, খাজা আদিল, খাজা আকমল, খাজা শাহেদ, খাজা নসরুল্লাহ, শৈলেন রায় বা টোনা বাবু ছিলেন এই চলচ্চিত্রের অভিনেতা। তবে এতে নারীচরিত্রে নারীরাই অংশ নেয়। নায়িকা চরিত্রে ছিলেন লোলিটা বা বুড়ি নামের এক বাইজি। চারুবালা, দেববালা বা দেবী নামের আরও দুই বাইজি এতে অভিনয় করেন। হরিমতি নামে একজন অভিনেত্রীও এতে অভিনয় করেন।

১৯৩১ সালে এই চলচ্চিত্র মুক্তি পায় ঢাকার অকুল হলে (অধুনা আজাদ হলো)। এর প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র

BanglaBook.org

মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০)। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৩৬-১৯৪২) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

'দ্য লাস্ট কিস' ঢাকা থেকে নির্মিত প্রথম নির্বাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র। ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানির প্রযোজনায় অম্বুপ্রসন্ন গুপ্ত নির্মাণ করেন নির্বাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'দ্য লাস্ট কিস'। ১৯২৭ সালের দিকে 'দ্য লাস্ট কিস' -এর চিত্রগ্রহণ শুরু হয়। নবাববাড়ির খাজা আজমল, খাজা আদিল, খাজা আকমল, খাজা নসরুল্লাহ, খাজা অজয়, খাজা আকিল, খাজা জহিরে, খাজা শাহেদ, শৈলেন রায় বা টোনা বাবু ছিলেন এই চলচ্চিত্রের অভিনেতা।

ঢাকা শহরের প্রাকৃতিক দৃশ্যসংবলিত 'দ্য লাস্ট কিস' ছবির দৃশ্য ধারণ করা হয় মতিঝিল, দিলকুশা, শাহবাগ, নীলক্ষেত ও আজিম-পুর বালিকা বিদ্যালয়ের কাছে নবাবদের বাগানে। এ ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ হতে প্রায় এক বছর সময় লেগেছিল।

'দ্য লাস্ট কিস' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন ঢাকা নবাব পরিবারের সদস্য খাজা আজমল ও নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেন ললিতা বা লোলিটা বা বুড়ি। ললিতা ছিলেন বাদামতলী পতিতালয়ের একজন যৌনকর্মী। চারুবালা, দেববালা (দেবী) নামের আরও দুই যৌনকর্মী এতে অভিনয় করেন। হরিমতি নামে একজন অভিনেত্রীও এতে অভিনয় করেন। একবছর পর লোলিটা তার আগের পেশায় ফিরে যান।

ঢাকায় চলিচ্চিত্রটির শুটিং হলেও প্রিন্ট ও প্রসেসিং হয় কলকাতায়। ১২ রিলের ছবিটি ১৯৩১ সালে এই চলচ্চিত্র মুক্তি পায় ঢাকার মুকুল হলে (অধুনা আজাদ হল)। এর প্রিমিয়ার শো উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৮-১৯৮০)। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (১৯৩৬-১৯৪২) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রিলিজের সময় নির্বাক এ ছবি বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় সাবটাইটেল করে দেওয়া হয়েছিল। প্রায় এক মাস এ ছবির প্রদর্শনী চলে।

BanglaBook.org

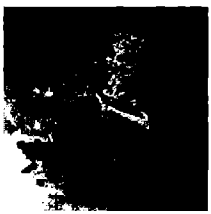

হারানো দিনের ঢাকার বাইজি

মাহবুব আলমওয়াকার এ খান

স্বামীর মৃতদেহ ভেলায় নিয়ে বেহুলা সুন্দরী ভেসে চলেছেন অমরাবতীর পথে, দেবতাদের কাছে মৃত স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইতে। দেবলোকে পৌঁছে বেহুলা তাঁর অপূর্ব নৃত্যগীতে দেবতাদের প্রসন্নতা লাভ করে স্বামী লখিন্দরের প্রাণ ফিরে পেলেন। বেহুলা নর্তকী ছিলেন না, ছিলেন ধনিক-বণিকের ঘরের কুলবধূ। কিন্তু ৬৪ কলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা নৃত্যবিদ্যাটি ভালোভাবেই রপ্ত করেছিলেন তিনি। এই কাহিনির যে সমাজতাত্ত্বিক দিকটি আমাদের চোখে পড়ে, সেটি হলো মধ্যযুগেও নাচ-গানের চর্চা বাংলার উচ্চকোটি সমাজের অন্তঃপুরেও আদৃত ছিল। বাংলাদেশে নাচ-গানের যে বরাবরই কদর ছিল, তার বড় প্রমাণ নানা মন্দির ও বিহারের গায়ে নর-নারীর নৃত্যদৃশ্য নিয়ে তৈরি টেরাকোটা ফলকের অপূর্ব সমারোহ ও প্রাচুর্য।

'বাঙালির বাদশা' ইলিয়াস শাহি সুলতানদের রাজধানী গৌড় পাণ্ডুয়ার নাচ-গানের চর্চার কথা লিখে গেছেন ১৫ শতকের গোড়ার দিকে সফরকারী চীনা দূত মাহুয়ান, যিনি চীন সম্রাটের রাজদূতদের

BanglaBook.org

ফরাসি চিত্রকর বেলেনস এর আঁকা বাইজির নৃত্য

সহকারী হিসেবে বাংলার সুলতানের দরবারে হাজির হয়েছিলেন। ভোজের সময় আনন্দ দেওয়ার জন্য সুলতানের গাইয়ে ও নাচিয়েদের দক্ষতা নিজের চোখে দেখেছিলেন তিনি। আরও একজন চীনা রাজদূত হুহিয়েন একই তথ্য জানিয়ে লিখেছেন, এরা যখন নিমন্ত্রণ করে তখন অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচের আয়োজন থাকে। নর্তকীদের পোশাকেরও একটি স্নিগ্ধ বর্ণনা দিয়েছেন তিনি এমনই ভাষায়, 'এরা হালকা লাল রঙের ফুল তোলা জামা পরে। শরীরের তলার দিকটায় এরা রঙিন রেশমের কাপড় জড়িয়ে রাখে। গলায় আর কাঁধে এদের পেনড্যান্ট আর হার। কবজিতে নীল আর দামি পাথর থাকে।' (বঙ্গবৃত্তান্ত অসীম রায়)

সুলতানি আমলে সোনারগাঁও ছিল রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের একটি বৃহৎ প্রশাসনিক ও সামরিক কেন্দ্র এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য নগর। অনেক গবেষক একে বাংলার সুলতানদের দ্বিতীয় রাজধানী হিসেবেও মনে করেন। সোনারগাঁও যে গৌড় পাণ্ডুয়ার মতো সংগীত ও নৃত্যকলার উর্বর ক্ষেত্র ছিল, এমনটি ধারণা করা অসংগত হবে না।

মোগল শাসনামলে সুবেদার ইসলাম খান রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় নিয়ে এলে এই নতুন রাজধানী জাহাঙ্গীরনগরে সংগীত আর নৃত্যের কেন্দ্রটি যে আরও প্রসারিত হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঢাকার একটি দক্ষ সংগীত ও নৃত্যশিল্পীর দল ছিল। মি. শার্লিমান তাঁর বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, ঢাকায় ইসলাম খানের দরবারে ১২০০ কাঞ্চনী শোভা পেত। যাদের পেশা নাচ-গান। এ থেকে অনুমিত হয়, ইসলাম খানের ঢাকা আসার আগেও এখানে গান-বাজনার ব্যাপক চর্চা ছিল। তা না হলে ১২০০ কাঞ্চনীর এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর দরবারে হাজির হওয়া অসম্ভব হতো। কাঞ্চনী ছাড়াও তাঁর দরবারে ছিল লুলি, হোরকানি ও ডোমনি এরা সবাই নাচনী মেয়ে। এদের জন্য তাঁর বার্ষিক খরচ হতো ৮০ হাজার টাকা। ইসলাম খানের সংগীত ও নৃত্যশিল্পীদের সুখ্যাতি মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের কানে পৌঁছাতে দেরি হয়নি। তিনি নাকি ঢাকা থেকে কিছু সেরা গায়ক ও নর্তকীকে মোগল শাহি দরবারের জন্য

BanglaBook.org

চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। সম্রাট তাঁর দরবারের সংগীতজ্ঞ প্রেমরঙ্গাকেও ঢাকায় ইসলাম খানের দরবারে পাঠিয়েছিলেন।

দীর্ঘদিন সুবে বাংলার রাজধানী ছিল ঢাকা। রাজধানীর মর্যাদা হারানোর পরও সংগীতের জন্য ঢাকার খ্যাতি ছিল অটুট। ১৮৫৭ এর পর এই খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পায়। লক্ষ্ণৌ অনেক বাইজি সংগীতজ্ঞ চলে আসেন মুর্শিদাবাদে এবং পরে ঢাকায়। তাঁদের সহায়তা করতেন নবাব পরিবারের বংশধরেরা, মৌলভীবাজারের মোগল বংশোদ্ভূত জমিদার ও নবাবপুরের ধনী বসাক পরিবার। এ ছাড়া যাঁরা সাহায্য করতেন তাঁরা হলেন ভাওয়ালের রাজপরিবার, কাশিমপুর বনিয়া ও পুবাইলের জমিদার। তখন লক্ষ্ণৌ, বেনারস, পাটনা ও কলকাতার প্রতিষ্ঠিত বাইজিরা ঢাকায় এসে তাঁদের অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন।

সংগীতের পুরোনো কেন্দ্র হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ঢাকায় ছিলেন কয়েক গুণ গুণী বাইজি। কণ্ঠসংগীতের ওস্তাদ হুসেন মিয়া ঢাকার অনেক বাইজিকে তালিম দিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে ঢাকার বাইজিদের আমন্ত্রণ জানানো হতো। বহিরাগত অনেক বাইজি ঢাকায় দীর্ঘদিন থেকে গেছেন। কেউ কেউ স্থায়ীভাবেও। আবার অনেকে প্রায়ই ঘুরে ফিরে ঢাকায় আসতেন। এসব অস্থায়ী বাইজির পাশাপাশি স্থানীয় মেয়েদেরও বাইজির পেশা বেছে নিতে দেখা গেছে। এই বাইজিদের সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়েছেন হাকিম হাবিবুর রহমান (১৮৮১-১৯৪৭), গনিউর রাজা, সৈয়দ তৈফুর, মুনতাসীর মামুন, সাঈদ আহমদ, অনুপম হায়াত ও সত্যেন সেন। এ ছাড়া পুরোনো পত্রপত্রিকা ও ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকেও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেছে। এসব সূত্রের দেওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই এ নিবন্ধটি লেখা হয়েছে।

ঢাকায় বাইজিদের পাশাপাশি খেমটাওয়ালিরাও দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব করেছেন। বাইজি নাচ-গান আর খেমটা নাচ-গানের মধ্যে পার্থক্যটা সত্যেন সেনের লেখায় ভালোভাবে ফুটে উঠেছে। খেমটা হলো হালকা ধরনের এবং আদিরসাত্মক। বাইজিরা এককভাবে নাচত। আর এককভাবে সংগীত পরিবেশন করত। বাইজি ও খেমটা

BanglaBook.org

নাচের মূল পার্থক্য হলো খেমটা নাচের মধ্যে পায়ের কাজটিই প্রধান এবং নৃত্যভঙ্গির মধ্য দিয়ে যৌন আবেদন সৃষ্টি করা হতো। অন্যদিকে 'বাইজি নাচে প্রধান ছিল হাতের ছন্দময় দোলা এবং মুখ, চোখ, নাক ও ঠোঁটের সূক্ষ্ম কম্পন।' বাইজিদের পোশাক ছিল পেশওয়াজ, চুড়িদার পাজামা-ওড়না, পায়ে চিকন ঘুঙুর। 'খেমটাওয়ালিরা জাতে উঠত বাইজি হয়ে,' লিখেছেন সত্যেন সেন।

নওয়াব আবদুল গনি ও নওয়াব আহসান উল্লাহর দরবারের কয়েকজন বাইজির উল্লেখ করেছেন হাকিম হাবিবুর রহমান। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সুপনজান, সেকালের নামী গায়িকা ও তবলাবাদক, এনাহীজান নওয়াব আবদুল গনির শাহবাগ উৎসবে নেচেছিলেন। হাকিম সাহেব তাঁকে শাহবাগের বার্ষিক উৎসবে দেখেন বলে লিখেছেন। তিনি উত্তর ভারত থেকে ঢাকায় এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আবেদী বাই এসেছিলেন পাটনা থেকে। তাঁর এক মেয়ে ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আন্নু, গান্নু ও নওয়াবীন এই তিন বোন নওয়াব আবদুল গনির দরবারে নিয়মিত নাচতেন, গাইতেন এবং মাসোহারা নিতেন। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি খ্যাতি ছিল নওয়াবীনের। তিনি বিশ শতকের চল্লিশ দশক পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। মুনতাসীর মামুন জানিয়েছেন, এই তিন বোনই 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' ভাড়া করে ১৮৮০ সালের নভেম্বরে টিকিটের বিনিময়ে ইন্দ্রসভা নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন।

ঢাকায় মহিলাদের নিয়ে এটিই ছিল প্রথম নাট্যাভিনয়। আচ্ছি বাই ছিলেন নওয়াব আবদুল গনির সবচেয়ে নামকরা বাইজি। লক্ষ্ণৌ থেকে ঢাকায় এসেছিলেন তিনি। নৃত্য ও গীতে সুনিপুণা আচ্ছি ছিলেন অনেকের ওস্তাদ। হাকিম হাবিবুর রহমান লিখেছেন, যে ঢাকায় আচ্ছি বাইয়ের মতো বড় নর্তকী তার পরে আর কেউ আসেনি।

১৯১৪-১৫ সালের দিকে তিনি মারা যান। এ ছাড়া যাঁদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাঁরা হলেন, ওয়াসু, রাতানী, জামুরদ, হীরা পান্না, ইমামী এবং তিনজন হিন্দু বাইজি অতুল, লক্ষ্মী ও কালী বাই। আখের খুকী নামের একজন খেমটাওয়ালির উল্লেখ করেছেন হাকিম

BanglaBook.org

হাবিবুর রহমান। খেমটা নাচ প্রদর্শন, বাংলা গান ও হিন্দি ঠুমরি গেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। আমিরজান বাইজি ছিলেন উনিশ শতকের ঢাকার বিখ্যাত গায়িকা ও নর্তকী। জিন্দাবাহারের রাজলক্ষ্মীও ছিলেন ঢাকার আরেক বিখ্যাত বাইজি। জিন্দাবাহারে তাঁর পাঁচ-ছয়টি বাড়ি ছিল। সংগীতশিল্পীর চেয়ে দান-ধ্যানের জন্য তিনি ছিলেন অধিক সম্মানিত।

১৮৮৬ সালে ভূমিকম্পের পর জিন্দাবাহারের কালীবাড়ি ভেঙে গেলে তা মেরামত করে দেন তিনি। রমনার কালীবাড়িও সাজানোর জন্য তিনি মোটা চাঁদা দিয়েছিলেন। মুনতাসীর মামুন আমিরজান ও রাজলক্ষ্মী সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক তথ্য দিয়েছেন। ১৮৭৪ সালে নওয়াব আবদুল গনি ঢাকা শহরে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য এক বৈঠকের আয়োজন করেন। সেই বৈঠকে রাজা-মহারাজা জমিদার ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই দুজন বাইজিও উপস্থিত ছিলেন। নবাব পানি সরবরাহ প্রকল্পে সবাইকে কিছু অর্থ সাহায্য করতে আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন মাত্র দুজন আমিরজান ও রাজলক্ষ্মী তাঁরা প্রত্যেকে ৫০০ টাকা করে দান করতে রাজি হয়েছিলেন। নবাব অবশ্য পরে কারও কাছ থেকে কোনো সাহায্য না নিয়ে নিজেই এক লাখ টাকা দান করেছিলেন।

উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকের দিকে ঢাকায় এসেছিলেন সিনেটের গনিউর রাজা। সে সময় ঢাকায় মধ্যবিত্তের বিনোদনের তেমন সুস্থ ব্যবস্থা ছিল না। তবে ঢাকা তখন বাইজিদের জন্য বিখ্যাত। গনিউর রাজা তাঁর আত্মজৈবনিক রচনায় বর্ণনা সীমিত রেখেছেন এই বাইজি এবং খেমটাওয়ালিদের মধ্যে। তিনি এই খেমটাওয়ালিদের একটি বর্ণনা দিয়েছেন এমনই ভাষায়:

'সহর ঘুরিতে ২ অপরাহ্নে [অপরাহ্নে] কিঞ্চিত জলযোগ করিলাম, ও আরও বেড়াইয়া প্রায় ৭ টার সময় সাচিবন্দর সারদা নাম্নী খেমটাওয়ালির দুতালার উপরে উঠিলাম ও উক্ত খেমটাওয়ালিকে গান-বাজনার যোগাড় করিতে সোপর্দা, ছামাজি ইত্যাদিকে ডাকাইয়া আনাইবার কথা বলিলাম, ও হুইচকি ব্রান্ডি সুডা ওয়াটার ইত্যাদির জন্য কতেক টাকা দিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্তের যোগাড় হইয়া গেল।

BanglaBook.org

'ছামাজি সারঙ্গ বাজাইতে লাগিল, সোপর্দা তবলা বাজাইতে আরম্ভ করিল ও মদ্যপায়ীদের মধ্যে ৫/৭ যে জনা হইয়াছিল তন্মধ্যে খেমটাওয়ালিই একজনকে ছাকি [অর্থাৎ পান পাত্র দাতা] নিযুক্ত করিল, ও সুডা ওয়াটার খুলিয়া মিশ্রিত করিয়া আমরাসহ প্রায় ৮/১০ জনাকে ক্রমান্বয়ে পাত্র বিলি করিতে লাগিল।

'ওদিকে খেমটাওয়ালি গান আরম্ভ করিল, ও সোপর্দা, ও ছামাজি ইত্যাদি একযোগে সাদত করিতে আরম্ভ করিল। গানবাদ্য খুব জমিল, সুরাপাত্রও অনবরত চলিতে লাগিল।...'

(সূত্র-ঢাকা সমগ্র ১ মুনতাসীর মামুন। ঢাকা-২০০৩।)

এখানে খেমটাওয়ালি প্রসঙ্গে গনিউর রাজার বলা একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিন তিনি সরলা নামের খেমটাওয়ালির বাড়িতে 'গান-বাজনা' শুনতে গিয়েছেন। সবাই চলে গেলে খেমটাওয়ালি তাঁকে বলেছিল, 'তুমি যে মুসলমান, তাহা আমি পূর্বেই বুঝিয়াছি, আমরা হিন্দু রমণী মুসলমানকে জায়গা দেই না, সমাজে দূষিত হইতে হয়। আমি বলিলাম, তোমাদের আবার সমাজ আছে নাকি? সে বলিল, থাকিবে বই কি, যদিও আমরা নাম লিখাইয়ছি তথাপি আমাদের হিন্দুয়ানি সবই বজায় আছে।' তাদের নৃত্য ও কণ্ঠের মাধুর্যের বর্ণনার পাশাপাশি গনিউর রাজা খেমটাওয়ালিদের দৌরাত্ম্য ও অন্ধকার জীবনের কথাও উল্লেখ করতে ভোলেননি।

বিশ শতকের প্রথম দিকে ঢাকার সবচেয়ে বিখ্যাত বাইজি ছিলেন জিন্দাবাহার লেনের দেবী বাইজি বা দেবী বালা। ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা মওদুদের ডায়েরি থেকে (সম্পাদনা অনুপম হায়াত) জানা যায়, ১৯১৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে খাজা হাবিবুল্লাহর বিয়ের অনুষ্ঠানে দেবী বাইজি ও অন্য এক বাইজি নাচ-গান করেছিলেন। দেবী বাইজি পরে প্রথম ঢাকায় নির্মিত পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র (নির্বাক) দ্য লাস্ট কিস-এ অভিনয় করেন। হরিমতি বাইজি ঢাকায় এসে ছিলেন। তিনিও এই নির্বাক ছবিটিতে অভিনয় করেন। শিল্পী পরিতোষ সেন তাঁর আত্মজৈবনিক রচনা জিন্দাবাহারে এক

BanglaBook.org

হরিমতি বাই সম্পর্কে লিখেছেন, 'হরিমতি বাইজির ঘরটি আমাদের বারান্দা থেকে পরিষ্কারই দেখা যায়। প্রতিদিনের অভ্যাসমতো ভৈরবী রাগে গান ধরেছেন, 'রসিয়া তোরি আখিয়ারে জিয়া লালচায়' ঠুংরি ঠাটের গানের এ কলিটির সুরের মাধুর্য্যে আমাদের জিন্দাবাহার গলিটি কানায় কানায় ভরে উঠেছে।'

বাইজিদের হাসি, গান আর আনন্দের পেছনে লুকিয়ে ছিল অনেক কান্না, বেদনা আর দীর্ঘশ্বাস। কারও জন্ম ঘোর অন্ধকারে ঢাকা, অথচ এর জন্য তার কোনো হাত নেই; কেউ প্রতারিত হয়ে পথের ভিখারি হয়ে শেষ জীবন কষ্টে কাটিয়েছেন। যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরা স্বীকৃতি পেয়ে বেগম হতে পেরেছেন। আবার এঁদের কুহকের বলি হয়েছে অনেকের সংসার, জীবিকা ও জীবন।

ঢাকার বাইজিদের দিন গত শতাব্দীর চল্লিশের দশকেই ফুরিয়ে যেতে থাকে। দেশ ভাগ ও জমিদার প্রথার উচ্ছেদ এঁদের পৃষ্ঠপোষকহীন করে ফেলে। আজ তাঁদের স্মৃতি রয়ে গেছে শুধু কিছু সংগীতজ্ঞ ও প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মানুষের অতীত চারণায়। আরও রয়ে গেছে তাঁদের দুলর্ভ ও দুস্প্রাপ্য রংচটা কিছু আলোকচিত্র, যার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বিস্মৃতির এক বিষাদময় ইতিকথা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

হারিয়ে যাওয়া বাইজি নাচ

স্বপন কুমার দাস

এককালে এ ঢাকা নগরীতে ছিল জমজমাট বাইজিপাড়া। পুরনো ঢাকার পাটুয়াটুলী ও জিন্দাবাহার লেনে ছিল বাইজিদের সবচেয়ে বড় আখড়া। সন্ধ্যা হলে এসব আখড়ায় বসত ধ্রুপদী নৃত্য-গীতের আসর। বাইজিরা অপরূপ সাজে সেজে সুরের মূর্ছনা তুলে আসরে নাচত। তাদের নাচ-গানের সুমিষ্ট আওয়াজে পুরো এলাকা মুখর হয়ে উঠত। ঢাকার সুবেদার, নবাব, রাজা ও জমিদারসহ অভিজাত ব্যক্তিরা বাইজিদের আখড়ায় এসে তাদের নৃত্যগীত উপভোগ করতেন। যাদের সামর্থ ছিল, তারা সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজি আনিয়ে নিজ রঙমহলে নাচ-গানের মাহফিল বসাতেন। সেকালে বাইজিদের মাহফিল করা ছিল নবাব-জমিদারদের অভিজাত্যের প্রকাশ।

অতীতে ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে 'বাই' শব্দ দ্বারা ধ্রুপদী নৃত্য-গীতে পারদর্শী সম্ভ্রান্ত মহিলাদের বোঝানো হতো। খুব ছোট থাকতেই তারা ওস্তাদের কাছে তালিম

BanglaBook.org

নিয়ে নৃত্যগীত শিখতেন। শিক্ষা শেষে শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতকে পেশা হিসেবে নিলে লোকে তাদের 'বাই' শব্দটির সম্মানসূচক 'জি' শব্দটি জুড়ে দিত, তখন তাদের নামে শেষে 'বাইজি' শব্দটি শোভা পেত। বাইজিরা সম্রাট, সুলতান, বাদশা, রাজা-নবাব ও জমিদারদের রঙমহলে শাস্ত্রীয় নৃত্যগীত পরিবেশন করে বিপুল অর্থ ও খ্যাতিলাভ করতেন। অর্থ আয়ের জন্য তারা যেমন বাইরে গিয়ে 'মুজরো' নাচতেন, তেমনি নিজেদের ঘরেও মাহফিল বসাতেন।

মুসলমান শাসকদের আগমনের বহু শতক আগে থেকেই এ অঞ্চলে ধ্রুপদী নৃত্য-গীতের প্রচলন থাকলেও বাইজিদের উদ্ভব ঘটে মূলত মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা। ধারণা করা হয়, ভারতে মোগল শাসন ব্যবস্থা স্থায়ী হওয়ার পর বাইজিদের প্রসার ঘটে। তখন সম্রাট, সুলতান, বাদশা ও নবাবদের অবসর সময় কাটানোর জন্য নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকত। বাইজিদের দিয়ে মাহফিল করা ছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ। পরে দিল্লীর শাসক শ্রেণির এ সংস্কৃতি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের শাসকদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। বাইজি হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মেরই হতেন। তারা খেয়াল, ঠুংরি ও গজল গাইতেন এবং নৃত্যের মাধ্যমে এসব গানের ভাব প্রকাশ করতেন। বাইজিদের নাচগানে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট, বাদশা ও নবাবগণ স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রাসহ হীরা-মুক্তার হার পর্যন্ত উপহার দিতেন।

বাইজিদের নাচগান উপভোগ করার জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি রঙমহলে আমন্ত্রিত হতেন। অনেক সময় বিশেষ কোনো মেহমানের আগমনের কারণেও বাইজিদের দিয়ে এমন সঙ্গীত মাহফিলের আয়োজন করা হতো। সেকালে বাইজিদের সামাজিক অবস্থানও ছিল বেশ উঁচুতে। নাচগান করে তারা যে পরিমাণ অর্থ ও উপহার সামগ্রী পেতেন তা দিয়ে তারা বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে পারতেন।

ঢাকায় বাইজিদের আগমন ঘটে সতেরো শতকের গোড়ার দিকে। শাহ সুজা যখন ঢাকার সুবেদার হয়ে আসেন, তখনই এখানে বাইজিদের আগমন। তখনো ঢাকায় বাইজিপাড়া প্রতিষ্ঠা পায়নি।

BanglaBook.org

শাহ সুজা সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে বাইজি আনিয়ে তার রঙমহলে মাহফিলের আয়োজন করাতেন। বাইজিদের নাচগানে ঢাকার অভিজাত ব্যক্তিবর্গ মুগ্ধ হতেন। এরপর থেকে ঢাকায় নিয়মিত এমন মাহফিল হতে থাকে। ঢাকায় ধীরে ধীরে বাইজি পেশার প্রসার ঘটে মাহফিল করে বিপুল অর্থ আয়ের সুযোগ থাকায় বাইজিরা ঢাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে তোলে। পাটুয়াটুলী ও জিন্দাবাহার লেন এলাকায় তারা বেশ ক'টি বাড়ি ক্রয় করে। নিজ বাড়ির বৈঠকখানায় মাহফিল করার পাশাপাশি বাইজিরা নবাব, রাজা ও জমিদারদের রঙমহল কিংবা বাগানবাড়িতে গিয়ে মাহফিল করত।

নবাব নুসরাত জং, নবাব শামসদ্দৌলা, নবাব কমরউদ-দৌলার সময় ঢাকায় বাইজিদের জমজমাট ব্যবসা দেখা যায়। এমনকি ইংরেজ আমলের প্রথম দিকেও বাইজিদের অত্যন্ত কদর ছিল। পাটুয়াটুলী ও জিন্দাবাহার বাইজি পাড়ায় এ সময় অভিজাত ব্যক্তিদের ভিড় লেগে থাকতো। এখানে সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত জলসা চলত। বাইজিদের নাচ-গাচের সুমধুর আওয়াজে পুরো এলাকা মুখর হত। বাইজিরা ছিল সুন্দরী এবং নৃত্যগীত পটিয়সী। অপরূপ সাজে সেজে জলসার আসরে যখন তারা গাইত এবং শরীরে ঢেউ তুলে নাচত, তখন অনেক নবাব ও জমিদারের বুকে কম্পন সৃষ্টি হতো। কেউ কেউ বাইজিদের প্রেমাসক্ত হয়ে পড়তেন।

এমন অনেক জমিদার ছিলেন যারা বাইজিদের নাচগানে মশগুল হয়ে দিবারাত বাইজিপাড়ায় পড়ে থাকতেন। ফলে সময় মতো সরকারকে রাজস্ব দিতে না পারার কারণে তাদের জমিদারি নিলামে উঠত। সেকালে যেসব বাইজি নাচগান ও রূপগুণে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাদের মধ্যে ছিলেন সুপন জান, খুন্নি বেগম, মুন্নিজান, বেগম জান প্রমুখ।

বাইজিদের সম্পর্কে ঢাকাবাসীর মধ্যে ছিল তীব্র কৌতূহল। বাইজিদের সম্পর্কে বহু কথা ঢাকাবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল। যার বেশিরভাগই ছিল কল্পনাপ্রসূত বাইজিদের বিশেষ ধরনের জীবনযাপন, কঠোর পর্দার মধ্যে বসবাস এবং প্রহরীদের

BanglaBook.org

প্রহরায় ঘোড়াগাড়িতে যাতায়াতের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের সম্পর্কে কৌতূহল ছিল পাহাড় প্রমাণ। পাটুয়াটুলীর বাইজিরা সঙ্গীদের নিয়ে হেঁটে খুব সকালে অদূরে বুড়িগঙ্গা নদীতে স্নানের জন্য যেতেন। তখন বুড়িগঙ্গা নদীর জল ছিল খুবই স্বচ্ছ এবং সুপেয়। স্নানপর্ব শেষে বাইজিরা যখন ফিরতেন তখন লোকজন গলির মুখে দাঁড়িয়ে থেকে সিক্ত বসনা বাইজিদের দেখে পুলকিত হত। এছাড়া সাধারণ মানুষের পূর্বে বাইজিদের দেখার আর কোনো সুযোগ ছিল না।

ভারতে ইংরেজ শাসন স্থায়ী হওয়ার পর বাইজি পেশায় ধীরে-ধীরে ধস নামে। ঢাকার বাইজি পাড়ায়ও এর হাওয়া লাগে। ইংরেজরা ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এদেশের নবাব, রাজা ও জমিদারদের আয়ের উৎস কমে যেতে থাকে। ফলে তাদের পক্ষে বাইজিদের পৃষ্ঠপোষকতা করা আর সম্ভব হয় না। তবে ইংরেজ আমলে এদেশে অপর একটি নব্য ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয় এরা বাইজিদের নাচগান উপভোগ করার চেয়ে শ্বেতাঙ্গ রমণীদের সঙ্গে বলড্যান্স উপভোগ করতে অধিক অর্থ ব্যয় করতে উৎসাহী ছিল। ফলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাইজিরা ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে। এ সময় প্রকৃত বাইজির অবর্তমানে এক শ্রেণীর নকল বাইজির উদ্ভব ঘটে।

নৃত্যগীত নয়, রূপ যৌবনই ছিল তাদের মূল সম্পদ। পোশাকে-আশাকে ছিল আটসাট, শরীরের উপরের অংশ ছিল স্পষ্ট। নাচগানের মধ্যেই খরিদ্দাররা তাদের শরীর স্পর্শ করতে পারত। এরা অনেক খদ্দেরকে একান্তে সঙ্গও দিত। সাধারণ মানুষের কাছে এদের চাহিদা বেড়ে যায় এবং প্রকৃত বাইজিদের শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতভিত্তিক পরিচ্ছন্ন জীবন চাপা পড়ে যায়। বিশ শতকের গোড়ার দিকে জিন্দাবাহারের বাইজিপাড়াটি উঠে যায়। ওই শতকের চল্লিশ দশকে পাটুয়াটুলীর বাইজিপাড়াটি একটি পতিতাপল্লীতে পরিণত হয়। এখন অবশ্য তারও কোনো চিহ্ন নেই।

BanglaBook.org

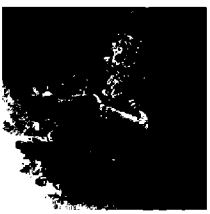

বাইজি উদ্ভবের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও শিল্পেসাহিত্যে বাইজি উপস্থিতি

শাফিক আফতাব

বাইজী শব্দটি ভাঙালে হয় বাই + জি। বাই মানে বাজানো বা চালানো। যেমন নৌকা বাই ; বাঁশি নাই। অর্থাৎ ধরা যায় কোনো কিছু বাজানো বা চালানো অর্থে বাই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। আর জী' অংশটি সম্মান সূচক শব্দ। নানাজি, বাপজি চাচাজি ইত্যাদি। তাহলে কোনো কাজ বিশেষ সম্মানের সহিত করাকেই বাইজি হিসেবে ধরা যায়। আবার অনেকের মতো এটা এসেছে বাজী থেকে। বাজী শব্দটি আগত বলে ধারণা করা হলেও সেটা মূলগত অর্থকে পরিপূর্ণভাবে ইঙ্গিত করতে পারে না বলে মনে হয়। বাজি বা বাজী শব্দের অর্থ কোনো কাজে প্রতিযোগীতামূলক অংশগ্রহণ। সম্ভববত এই অর্থ থেকে বাজীর অর্থ হয়েছে বিনোদনমূলক শারীরিক ভঙ্গি প্রদর্শন। কালক্রমে শারীরিক অঙ্গদ্বারা নৃত্যগীতিতে বিমোহিত করা কোনো রমণীকে বাইজি হিসেবে গণ্য হয়েছে।

BanglaBook.org

১১৬ ঢাকার বাইজি উপাখ্যান

প্রথমত শারীরিক ভঙ্গি ও নৃত্যঝঙ্কারে মোহিত করা বিনোদিনী যেকোনো মেয়েকে বাইজি বলা হলেও সময়ের পরিক্রমায় এটি পেশা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে ধারণা করা হয়। অতীতে ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাজ্যে 'বাঈ' শব্দ দ্বারা ধ্রুপদী নৃত্য-গীতে পারদর্শী সম্ভ্রান্ত মহিলাদের বোঝানো হত বাল্য বয়স থেকেই ওস্তাদের কাছ থেকে তালিম নিতে হতো এইসব মেয়েদের। শিক্ষা শেষে শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতকে পেশা হিসেবে নিলে লোকে তাদের 'বাঈ' শব্দটির সম্মানসূচক 'জি' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হত। তখন তাদের নামে শেষে 'বাইজি' শব্দটি শোভা পেত।

গবেষকের মতে খ্রিস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলায়, বিশেষ করে কলকাতায় বাইজিদের আগমন ঘটতে থাকে। অযোধ্যায় বিতাড়িত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহর কলকাতার মেটিয়া বুরুজ এলাকায় নির্বাসিত জীবনযাপনকালে সেখানে যে সংগীত সভার পত্তন ঘটে, তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক বাঈজির আগমন ঘটে। বেশির ভাগ বাইজিই রাগসংগীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্যে উচ্চশিক্ষা নিতেন। বাইজিদের নাচ-গানের আসরকে মুজরো বলা হয়, আবার তাকে মেহফিল বা মাহফেলও বলা হয়ে থাকে। মেহফিলে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অংশগ্রহণ ছাড়াও কোনো কোনো বাইজি রাজা-মহারাজা-নবাবদের দরবার থেকে নিয়মিত মাসিক বেতন পেতেন। বাইজিদের নাচ-গানে মোহগ্রস্ত হওয়ার কারণে কোনো কোনো নবাব-রাজা-মহারাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তির পারিবারিক ও আর্থিক জীবনে বিপর্যয়েরও সৃষ্টি হয়েছে।

ঢাকায় বাইজিদের নাচ-গান শুরু হয় মুঘল আমলে। সুবাহদার ইসলাম খাঁর দরবারে (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব) যারা নাচ-গান করতেন তাদের 'কাঞ্চনী' বলা হতো। উনিশ শতকে ঢাকার নবাব নুসরাত জং, নবাব শামসুদ্দৌলা, নবাব কমরুদ্দৌলা এবং নবাব আবদুল গণি ও নবাব আহসানুল্লাহর সময় বাইজিদের নাচ-গান তথা মেহফিল প্রবলতা পায়। তারা আহসান মঞ্জিলের রংমহল, শাহবাগের ইশরাত মঞ্জিল, দিলকুশার বাগানবাড়িতে নৃত্য-গীত পরিবেশন করতেন। ঢাকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব

BanglaBook.org

বাইজি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাদের মধ্যে লক্ষ্মনৌর প্রখ্যাত গায়ক ও তবলাবাদক মিঠন খানের নাতি সাপান খানের স্ত্রী সুপনজান উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকায় ছিলেন।

১৮৭০-এর দশকে ঢাকার শাহবাগে নবাব গণির এক অনুষ্ঠানে মুশতারী বাই সংগীত পরিবেশন করে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবদুল গফুর খানের নজরে পড়েছিলেন। ১৮৮০-এর দশকে শাহবাগে এলাহীজান নামে আরেক বাইজির নৃত্য ও করুণ পরিণতির দৃশ্য দেখেছিলেন হাকিম হাবিবুর রহমান। নবাব গণির দরবারে নাচ-গান করতেন পিয়ারী বাই, হীরা বাই, ওয়ামু বাই, আবেদী বাই, আন্নু নান্নু ও নওয়াবীন বাই। শেষোক্ত তিন বোন ১৮৮০-এর দশকে ঢাকার নাটক মঞ্চায়নের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ঢাকার অন্য খ্যাতিমান বাইজিদের মধ্যে ছিলেন বাতানী, জামুরাদ, পান্না, হিমানী, আমিরজান, রাজলক্ষ্মী, কানী, আবছন প্রমুখ। এছাড়া কলকাতা থেকে মাঝেমধ্যে ঢাকায় মুজরো নিয়ে আসতেন মালকাজান বুলবুলি, মালকাজান আগরওয়ালী, জানকী বাই, গহরজান, জদ্দন বাই, হরিমতী প্রমুখ। (সূত্র : ঢাকার বাইজি কাহিনী, আমরা ঢাকা, ১৩ ই মে, ২০১৫)

বাইজীদের উদ্ভব যেভাবেই হোক রাজবাদশাদের মনোরঞ্জনের জন্য বাইজিদের বিশেষ ভূমিকা আছে। বিলাসব্যসনে মত্ত থাকা রাজা বাদশারা এইসব পটু বাইজিদের নিয়ে রাজমহলে অধিক সম্মানীয় দিযে রাখতো। শুধুমাত্র নৃত্যগীতিতে মধুরঝঙ্কারে তুষ্ট হত না তারা। শারীরিক কামনাবাসনা ও দেহ সম্ভোগের বিষয়টিও অগ্রগণ্য ভূমিকা পেত। ফলে মধ্যযুগে রাজাবাদশার অন্তপুরে বাইজিদের দাপট ও প্রভাব ছিল উল্লেখ করার মতো। রাজার রক্ষিতা হিসেবে আমরা যাদের উল্লেখ পাই – বাইজিদের মধ্যে অনেকেই এই রক্ষিতা হিসেবে থাকতো। আবার অনেকে টাকার বিনিময়ে নেচে গেয়ে বিদায় হত। পেশাজীবী বাইজিরা দৈহিক কামনা-কামনার বিষয়টি এড়িয়ে যেতো।

সঙ্গীতশাস্ত্রে ও শিল্পসাহিত্যে বাইজিদের অবদান উল্লেখ করার মতো। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি সঙ্গীতে ও নৃত্যে পারদর্শী

BanglaBook.org

মেয়েরাই বাইজি হিসেবে বিবেচিত হতো। তাই দেখা যায় শিল্পচর্চার সঙ্গে বাইজিরা প্রত্যেক্ষভাবে জড়িত। ফলে দেখা যায় পালাগান, নাটক যাত্রা প্রভৃতি শিল্পমাধ্যমে তাদের ব্যাপক প্রভাব। আধুনিকযুগে সিনেমা ও নাটকে বাইজিদের নৃত্য ও সঙ্গীত শিল্পের মূলবিষয়টি ফুটিয়ে তুলতে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে।

সাহিত্যে বাইজিদের অবদান খাটো করে দেখার নয়। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের বাইজি প্রসঙ্গ টেনেছেন। উপন্যাসের কাহিনী অগ্রগামী করতে ও পল্লবিত করতে বাইজি উপাখ্যানের প্রভাব আছে। পদ্মবতী নিজের নাম পরিবর্তন করে লুৎফুন্নেসা নাম ধারণ করে। রাজমহলে সে নতৃগীতে পারঙ্গম হয়ে উঠলে সম্রাটপুত্র সেলিম তাকে গ্রহণ করার জন্য মরিয়া ওঠে।

গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে আরও দেখা যাবে দেহপসারিণীর সঙ্গেও বাইজিদের যোগ আছে। কারণ যেহেতু রাজা বাদশার মনোরঞ্জনের জন্য বাইজিরা নীত হত। ফলে অনেক বাইজি রাজাদের টাকার বিনিময়ে ও কিংবা স্বর্ণালঙ্কার ও অন্য কোনো সম্মানীয়ের জন্য দেহদানের সঙ্গে কালক্রমে তারা দেহ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়তো। তবে বাইজিরা যেকারণেই রাজদরবারে নীত হোক না কেন তারা সম্মানের সাথেই রাজমহলে ঠাঁই পেত।

বাইজি যেভাবেই জন্ম হোক, শাস্ত্রীয়নৃত্য ও সঙ্গীতে অগাধ দখল ছিলো তাদের। কালক্রমে অনেক বাইজি রাজার টাকার লোভে কিংবা চারিত্রিক ত্রুটির জন্য বিপথগামী হলেও শিল্পে ও সাহিত্যচর্চায় তারা ছিল একনিষ্ঠ প্রাণ। সাহিত্যের শাখায় কিছুটা কম হলে সঙ্গীত ও নৃত্যবিদ্যায় তাদের আছে অগাধপাণ্ডিত্য। বোধ করি আজকের নৃত্যশাস্ত্রের বহুলবিমলরূপের পশ্চাতে আছে বাইজিদের চর্চা ও চয়নগীতি।

BanglaBook.org

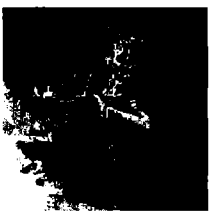

‘পদ্মপাতার জল’ এক বাইজি প্রেমের উপাখ্যান

রাজীদ সিজন

ঊনবিংশ শতাব্দীর এক জমিদার পুত্রের প্রেমলীলা পদ্মপাতার জল চলচ্চিত্রটিতে রূপায়িত হয়েছে। রিজোয়ান নামের সেই জমিদার পুত্র তার নিজ বাড়ি থেকে দূরের এক শহরের কলেজে পড়তে এসে ফুলেশ্বরী নামের এক বাইজির প্রেমে নিমজ্জিত হতে থাকে! একপর্যায়ে রিজোয়ান তার পড়াশোনা, ক্লাস, পরিবার তথা তার জগত-সংসারের কথা ভুলে উচ্চ মূল্যে দিনের পর দিন বাইজি মহলে দিনযাপন করতে থাকে। অবশেষে প্রেম তাদের দু'জনের জীবনেই এক ভিন্ন পরিণতি নিয়ে হাজির হয়। গল্পের বয়ানে উঠে আসে সে সময়কার সামাজিক রীতি-প্রথা, আসবাব, পোষাক-আশাক, যানবাহন এমনকি মুদ্রাও।

কথিত আছে, সম্রাট জাহাঙ্গীরও ঢাকার রাজনর্তকীদের মুঘল শাহী দরবারে নাচিয়েছিলেন! সুলতান, রাজা, জমিদার ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাইজি মহল প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। রঙ্গমহলে

BanglaBook.org

নাচে-গানে মুজরোয় বৈচিত্র্যময় এক জীবন অতিবাহিত করেছে সেসব বাইজি। যাদের অধিকাংশই পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। তাই হয়ত স্বাধীনতার তৃপ্তি পেতে এরা সত্যি প্রেমের সন্ধানে থাকত। কারণ হয়ত কেউ এদের অর্ধাঙ্গীনি করার সাহস বা ইচ্ছা করত না। এরা শুধু জমজমাট মাহফিল জমিয়ে বা অন্যান্য উপায়ে উচ্চশ্রেনির মনোরঞ্জন করত।

রঙ্গমহলে থেকেও সমাজের মূল স্রোতের বাইরে একরকম প্রান্তিক সীমানায় যেন আবদ্ধ ছিল এসব বাইজি। তাই এদের সাজসজ্জা ও ভারি পোশাক-গহনার ভেতরে লুকিয়ে থাকা আর্তনাদকে অনেক লেখক, সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র নির্মাতা তাদের শিল্পকর্মে উপজীব্য করেছেন কালে কালে।

বাইজি কেন্দ্রিক বহু চলচ্চিত্র ভারতে বিভিন্ন দশকে তৈরি হয়েছে। সে ক্ষেত্রে পদ্মপাতার জল বাংলাদেশে বাইজি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে পুরোনো কিছু নয়। সব বাইজি ঘরানার চলচ্চিত্রের মতো এটিও সেরকম প্রথাগত একটি চলচ্চিত্র যেখানে এক বাইজি পরাধীনতার নদী সাচ্চা প্রেম নৌকায় পার হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

বলিউডের 'পাকিজাহ' (১৯৭২) চলচ্চিত্রে এক বন কর্মকর্তা এক বাইজির প্রেমে পড়ে, 'উমরাও জান' (১৯৮১) চলচ্চিত্রে এক তরুণ নবাবও এক বাইজির প্রেমে পড়ে! প্রেম উদ্যানে তাদের করুণ পরিণতিও সেসব চলচ্চিত্র দেখিয়েছে। তাই বলে 'উমরাও জান' আর 'পাকিজাহ' এক এমন কিছু নয়। তবে আমাদের তথাকথিত বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রের প্রথা অনুযায়ী চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে গেলেই সবকিছুতেই তরুণ হৃদয়ঘটিত প্রেমের উপস্থিতি যুক্ত করতেই হয়! তবে বাইজি ঘরানার চলচ্চিত্রের মধ্যে শ্যাম বেনেগালের 'মান্ডি' (১৯৮৩) হয়ত এসব স্টেরিওটাইপের বাইরে ছিল।

তার মানে এই নয় যে পদ্মপাতার জল বাইজি প্রেম উপাখ্যান প্রদর্শন করে মহাভারত অশুদ্ধ করে ফেলেছে! তবে দর্শক হিসেবে যখন সিনেমা দেখতে যাই তখন সবসময় আশা থাকে যে নতুন

BanglaBook.org

কোন উপাখ্যান দেখব। বোধ হয় এ চলচ্চিত্রের মধ্যে একমাত্র এর সংলাপই এর বৈশিষ্ট্যকে এক অনন্য মাত্রা প্রদান করেছে। সুন্দর কবিতা ও যথার্থ সংলাপ কাহিনি উপযোগী হয়েছে এবং চলচ্চিত্রে গল্পের গোড়াপত্তনে কিছু রসবোধপূর্ণ সংলাপ ও দৃশ্যও খুব আকর্ষণীয় ঠেকেছে।

চলচ্চিত্রের গল্প হোক পরিচিত বা টিপিক্যাল তবে এর বয়ান উপস্থাপন যদি ভিন্ন হয় সে ক্ষেত্রে এটা অনেকটা নতুনত্ব লাভ করে। যদিও পদ্মপাতার জলের ন্যারেটিভ সেভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

চলচ্চিত্র যতই বাস্তবতাকে উপস্থাপন করুক না কেন, সেটা কখনও বাস্তবতা না! সেটা হতে পারে বাস্তব সত্য ঘটনা, তবে তা চলচ্চিত্রের বাস্তবতায় উপস্থাপিত হয়। তার মানে এই নয় যে সেটা সবসময় কল্পচিত্র! তবে চলচ্চিত্র যে কল্পচিত্রও উপস্থাপন করে না এমনও নয়। তবে কল্পচিত্র উপস্থাপনের ক্ষেত্রেও ঠিক আমাদের জানা বাস্তবতা এবং যৌক্তিকতার নিরিখেই কিন্তু সে কল্পনাকে চলচ্চিত্রের ভাষায় এবং বাস্তবতায় নির্মাণ করা হয়। সেরকম পদ্মপাতার জল কোন বাস্তব গল্পের আখ্যান নয়, তবে একটা অঞ্চলের একটা সময় ও সামাজিক বাস্তবতার কল্পচিত্র মাত্র। তাই সেই সময় ও সমাজকে চিত্রায়িত করতে প্রয়োজন যজ্ঞের আয়োজন। সেই আয়োজনে যদি বিচ্যুতি ঘটে, তবে সেটা তখন অবিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। এই চলচ্চিত্রে পোশাক নির্বাচনে সেরকম সতর্কতা কেন অবলম্বন করা হয়নি তাই বোধ্যগম্য নয়।

গানের দৃশ্য আসলেই পোশাক-পরিচ্ছদ উনবিংশ শতকের বলে মনে হয় না! তার ওপর ফুলেশ্বরীর চুলের স্টাইল আরও ভয়ঙ্কর! উনবিংশ শতকের একটা বাই-এর চুল হালকা লালচে রঙ করা। তবে সেটা মেহেদির রঙও নয়! বর্তমানে চুলে রঙের যে স্টাইল সেটাই প্রতীয়মান হলো! মনে হয় বিদ্যা সিনহা মিমের চুলের ধরন, স্টাইল করে লাগানো রঙ কিছুই পরিবর্তন করা হয়নি! পোশাক-পরিচ্ছদ ও সমসাময়ীক চুলের স্টাইল, সংলাপ প্রক্ষেপণে ও বডি ল্যাংগুয়েজের ধরন দেখে মাঝে মধ্যে বিভ্রান্ত হয়েছি যে, অন্তত এটা শ' খানেক বছর আগের গল্পের বয়ান হচ্ছে নাকি সমসাময়িক!

BanglaBook.org

তবে রঙ্গমহলের মুজরোর আয়োজনে শিল্প নির্দেশক যথার্থ প্রচেষ্টা করেছেন বাইজি মহল ও এর আবহের সৃষ্টিতে। তথাপি পরিচালকের মাথায় রাখার দরকার ছিল কিছু সরাইয়ের পানপাত্র, হাতের আংটি, রঙিন পর্দা-আলপনা, গহনা ও পুরোনো জমিদার ভবন দেখালেই সেটা উনবিংশ শতাব্দির বাংলা মনে হবে এমন নয়! সর্বোপরি ধারাবাহিকতা রক্ষাও সে ক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজনীয়। ঔপনিবেশিক আমলের বাংলার গল্প নির্মাণে পরিচালক যথাথ লোকেশন ও অনেক বহির্দৃশ্য দেখালেও কোন ইংরেজ-ফিরিঙ্গিকে কোন ফ্রেমে দেখা যায়নি! তার ওপর ফুলেশ্বরীর এক সহকর্মী বাইজি রেজোয়ান ও ফুলেশ্বরীকে তার ঘরে আশ্রয় দেয়ার পরে বলে 'এত বছর অন্যের জন্য গেয়েছি এবং নেচেছি! আজ নিজেদের জন্য গাইব ও নাচব'। সে সংলাপ শুনে মনে হলো কোন ধ্রুপদ নাচ-গানের মুজরো দেখতে পাব। কিন্তু বলিউড সিনেমার মতো মডার্ন কোরাস ডান্স দেখে হতবিহ্বল হলাম!

পরিচালক বলিউডের সিনেমার ও টিভি সিরিয়ালের প্রতি যে অতিভক্ত তা এই চলচ্চিত্রটি দেখলেই বোঝা যায়! বিশেষত ঘরের ভেতরের দৃশ্যগুলোর ক্যামেরার মোশন ভারতীয় টিভি সিরিয়ালের আদলে! যদিও এই চলচ্চিত্রে মাহফুজুর রহমান খান চিত্রগ্রাহক হিসেবে তার সর্বোচ্চ দিয়েছেন।

ছোট দৃশ্যে বড় সাহেব হিসেবে শহীদুজ্জামান সেলিমের অভিনয় পর্দা কাঁপিয়েছে। যদিও একটি দৃশ্যে পরিচালক খেয়াল না করার কারণেই হয়ত 'বড় সাহেবের' হাতে থাকা নিঃশেষ হয়ে আসা চুরুটটি পরের ফ্রেমে হঠাত বড় হয়ে যায়! এসব ছোটখাটো বিষয় হয়ত বড় বাজেটের বড় যজ্ঞের এই ফিল্মে খেয়াল করার মতো নয়! তবে পুরো চলচ্চিত্রেই আবহ সঙ্গীতের কাজ ভাল মনে হয়েছে। বিদ্যা সিনহা মিমও সুন্দরী আবেদনময়ী বাইজি হিসেবে ভাল অভিনয় করেছে।

আবেগঘন দৃশ্য গুলোতেও তার অভিনয় ভাল ছিল তবে চলচ্চিত্রের সার্বিক গঠন, গল্প অগ্রসরের ধরন ও বুননে সেই

BanglaBook.org

আবেগঘন দৃশ্যগুলো হয়ত ওই অনুভূতিটা দর্শকের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে সঞ্চারের ক্ষেত্রে ব্যর্থ থেকেছে। তবে তন্ময় তানসেনের সাহস অবশ্যই বিবেচনা করার মতো। তিনি অন্তত চেষ্টা করেছেন পদ্মপাতার জল যেন কচুপাতার জল হয়ে না যায়। সেটা তার চলচ্চিত্র দেখলে অন্তত সেই প্রচেষ্টা উপলব্ধি করা যায়। দর্শকদের ভিন্ন স্বাদ প্রদানে তার এই সাহসী পদক্ষেপ অবশ্যই প্রশংসনীয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাইজিকথা

রহিমা আক্তার মৌ

মায়ের মৃত্যুর পর সৎ মায়ের অত্যাচারে বারো-তেরো বছর বয়সী নিপা অজানার উদ্দেশে বের হয়। দুর্ঘটনার শিকার হয়ে জায়গা হয় ট্রাক ড্রাইভার মজিদের পরিবারে। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী মজিদের কু-নজর পড়ে কিশোরী নিপার উপর। বিষয়টা পরিবারে জানাজানি হলে সব দোষ আসে নিপার কাঁধে। এক পর্যায়ে এই আশ্রয় হারিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে কাজ নেয় উচ্চবিত্তের বহুতল ভবনে। ততদিনে নিপা পরিপূর্ণ এক যুবতি। এই বয়সে শারীরিক চাহিদা তার প্রয়োজন। একই সাথে বয়স্ক বাবা ও প্রাপ্ত বয়সী ছেলের নজরে নিপা। কৌশলে বছর খানেক দু'জনকেই সঙ্গ দিয়ে যায় সে। বাবা বা ছেলে কারো সাথে অবৈধ মেলামেশার ফলে গর্ভে সন্তান। নিপা বয়স্ক পুরুষ (গৃহকর্তা) কে ভয় দেখিয়ে বলে, এই সন্তান নষ্ট করে দিতে, না করলে অল্প বয়সী ছেলেকে ফাঁসিয়ে দিবে। সন্তান নষ্ট করার সাথে সাথে লাইগেশন করে নেয় নিপা। যেনো আর কোন

BanglaBook.org

সন্তান গর্ভে না আসে। জানাজানির পর এই আশ্রয় হারিয়ে লীলা মা'র (বস্তির সর্দ্দারনি) মাধ্যমে জায়গা হয় পতিতা পাড়ায়। সেখানে রোজ আসতো হায়দার ইলিয়াস। অন্য নারীদের খুব একটা পছন্দ করতো না ইলিয়াস। একটানা তিন-চার বছর যাতায়াত করে ঠিক করে নিপাকেই সে বিয়ে করবে। বিয়ে করে সন্তানবিহীন সংসার গড়ে তোলে ওরা। এটা আমার লেখা 'মানবী' গল্পের সারাংশ। গল্প হলেও এটি একটি সত্য ঘটনা।

প্রশ্ন হতে পারে, 'বাইজি নিয়ে লিখতে এসে নিপার মতো একজন পতিতা বা দেহ কর্মীর কথা কেনো?'

উপরের ঘটনা সামান্য একটা উদাহরণ, আর এই উদাহরনের প্রমাণ হলো...

আনন্দ উল্লাসের পাশাপাশি একাকিত্বের সময় কাটাতে বাইজি পাড়ায় আসে অনেকে। এতে করে প্রকৃত বাইজিদের শাস্ত্রীয় নৃত্যগীতভিত্তিক পরিচ্ছন্ন জীবন চাপা পড়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যের মাঝে। কুড়ি শতকের গোড়ার দিকে ঢাকার জিন্দাবাহারের বাইজিপাড়াটি উঠে যায়। ওই শতকের চল্লিশ দশকে পাটুয়াটুলীর বাইজিপাড়াটি একটি পতিতাপল্লীতে পরিণত হয়। এখন অবশ্য সেই পতিতাপল্লীর কোনো স্মৃতি চিহ্ন নেই।

নৃত্যবিদ্যা হলো চৌষট্টি কলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলা। যারা এই কলায় খেয়াল, ঠুংরি ও গজল গাইতেন এবং নৃত্যের মাধ্যমে এসব গানের ভাব প্রকাশ করতেন, তাদের 'বাইজি' বলা হতো। খৃস্টীয় আঠারো শতকের শেষার্ধে বাংলায়, বিশেষ করে কলকাতায় বাইজিদের আগমন ঘটতে থাকে। মুসলমান শাসকদের আগমনের বহু শতক আগে থেকেই নৃত্য-গীতের প্রচলন থাকলেও বাইজিদের উদ্ভব ঘটে মূলত মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায়।

কারো কারো মতে, ভারতে মোগল শাসন ব্যবস্থা স্থায়ী হওয়ার পর বাইজিদের প্রসার ঘটে। সম্রাট, সুলতান, বাদশা ও নবাবদের অবসর সময় কাটানোর জন্য নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকতো। বাইজিদের দিয়ে মাহফিল করা ছিলো

BanglaBook.org

তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ। বাইজিদের 'মাহফিল' করা ছিল নবাব-জমিদারদের অভিজাত্যের প্রকাশ। কিন্তু আস্তে আস্তে তা সাধারণ মানুষের কাছে অন্য ভাবে উপস্থিত হতে থাকে। অযোধ্যায় বিতাড়িত নবাব ওয়াজেদ আলী শাহর কলকাতার মেটিয়া বুরুজ এলাকায় নির্বাসিত জীবনযাপন কালে সেখানে যে সঙ্গীত সভার পত্তন ঘটে, তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক বাইজির আগমন ঘটে।

বেশির ভাগ বাইজিই রাগসঙ্গীত ও শাস্ত্রীয় নৃত্য বিশেষত কত্থকে উচ্চশিক্ষা নিতেন। বাইজিদের নাচ-গানের আসরকে 'মুজরো' বলা হয়, আবার কোথাও কোথাও তাকে 'মেহফিল' বা 'মাহফেল'ও বলা হয়ে থাকে।

মেহফিলে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে অংশগ্রহণ ছাড়াও কোনো কোনো বাইজি রাজা-মহারাজা-নবাবদের দরবার থেকে নিয়মিত মাসিক বেতন পেতেন। বাইজিদের নাচ-গানে মোহগ্রস্ত হওয়ার কারণে কোনো কোনো নবাব-রাজা-মহারাজা বা ধনাঢ্য ব্যক্তির পারিবারিক ও আর্থিক জীবনে বিপর্যয়েরও সৃষ্টি হয়েছে।

এক সময় বাংলাদেশে নাচ-গানের যে কদর ছিল তার বড় প্রমাণ নানা মন্দির ও বিহারের গায়ে নর-নারীর নৃত্যদৃশ্য নিয়ে তৈরি টেরাকোটা ফলকের অপূর্ব সমারোহ ও প্রাচুর্য। হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের নারীরাই এই নাচ গানের সাথে যুক্ত ছিলেন।

অনেকের মতে, ঢাকায় বাইজিদের নাচ-গান শুরু হয় মুঘল আমলে। তবে সব জায়গায় এদের একই নামে ডাকা হতো না। সুবাহদার ইসলাম খাঁর দরবারে যারা নাচ-গান করতেন তাদের 'কাঞ্চনী' বলা হতো।

উনিশ শতকে ঢাকার নবাব নুসরাত জং, নবাব শামসুদ্দৌলা, নবাব কমরুদ্দৌলা এবং নবাব আবদুল গণি ও নবাব আহসান উল্লাহর সময় বাইজিদের নাচ-গান তথা মেহফিল প্রবণতা পায়। তারা আহসান মঞ্জিলের রঙমহল, শাহবাগের ইশরাত মঞ্জিল, দিলকুশার বাগানবাড়িতে নৃত্য-গীত পরিবেশন করতেন।

BanglaBook.org

ঢাকায় বাইজিদের আগমন ঘটে সতেরো শতকের গোড়ার দিকে। শাহ সুজা যখন ঢাকার সুবেদার হয়ে আসেন, তখন এখানে বাইজিদের আগমন হলেও বাইজিপাড়া প্রতিষ্ঠা পায়নি শাহ সুজা সুদূর লখনৌ থেকে বাইজি আনিয়ে তার রঙমহলে মাহফিলের আয়োজন করাতেন। বাইজিদের নাচ-গানে ঢাকার অভিজাত ব্যক্তিবর্গ মুগ্ধ হতেন। এরপর থেকে ঢাকায় নিয়মিত এমন মাহফিল হতে থাকে আর ধীরে ধীরে ঢাকায় বাইজি পেশার প্রসার ঘটে।

১৮৭০-এর দশকে ঢাকার শাহবাগে নবাব গণির এক অনুষ্ঠানে মুশতারী বাই সঙ্গীত পরিবেশন করে প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবদুল গফুর খানের নজরে পড়েছিলেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে যেসব বাইজি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাদের মধ্যে লখ্‌নৌর প্রখ্যাত গায়ক ও তবলাবাদক মিঠন খানের নাতি সাপান খানের স্ত্রী সুপনজান উনিশ শতকের শেষ দিকে ঢাকায় ছিলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীরও ঢাকার রাজনর্তকীদের মুঘল শাহী দরবারে নাচিয়েছিলেন! সুলতান, রাজা, জমিদার ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্রমে বাইজি মহল প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। রঙ্গমহলে নাচে-গানে মুজরোয় বৈচিত্র্যময় এক জীবন অতিবাহিত করেছে সেসব বাইজি। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে ঢাকার বাইজিদের আমন্ত্রণ জানানো হতো। বহিরাগত অনেক বাইজি ঢাকায় দীর্ঘদিন থেকে গেছেন। কেউ কেউ স্থায়ীভাবেও। আবার অনেকে প্রায়ই ঘুরেফিরে ঢাকায় আসতেন। এসব অস্থায়ী বাইজির পাশাপাশি স্থানীয় মেয়েদেরও তখন বাইজির পেশা বেছে নিতে দেখা গেছে।

ঢাকায় বাইজি পাড়া হিসাবে গঙ্গাজলি ও সাচিবন্দর ছিল। পাটুয়াটুলী ও জিন্দাবাহার লেনে ছিল বাইজিদের সবচেয়ে বড় আখড়া। ইসলামপুর ও পাটুয়াটুলীর মোড় থেকে যে পথটি ওয়াইজঘাট নামে বুড়িগঙ্গার দিকে চলে গেছে তার নাম ছিল গঙ্গাজলি। পুরানো ঢাকার সন্ধ্যা হলে এসব আখড়ায় বসত নৃত্য-গীতের আসর তবলার বোল, সেতারের ঝঙ্কার আর নূপুরের নিক্কর গঙ্গাজলির পরিবেশ মুখরিত হয়ে উঠতো।

BanglaBook.org

বাইজিরা অপরূপ সাজে সেজে সুরের মূর্ছনা তুলে আসরে নাচতো। তাদের নাচ-গানের সুমিষ্ট আওয়াজে পুরো এলাকা মুখর হয়ে উঠতো। ঢাকার সুবেদার, নবাব, রাজা ও জমিদারসহ অভিজাত ব্যক্তিরা বাইজিদের আখড়ায় এসে তাদের নৃত্যগীত উপভোগ করতেন। যাদের সামর্থ ছিল, তারা সুদূর লখ্‌নৌ থেকে বাইজি আনিয়ে নিজ রঙমহলে নাচ-গানের মাহফিল বসাতেন।

বাইজিরা সম্রাট, সুলতান, বাদশা, রাজা-নবাব ও জমিদারদের রঙমহলে শাস্ত্রীয় নৃত্যগীত পরিবেশন করে বিপুল অর্থ ও খ্যাতিলাভ করতেন। অর্থ আয়ের জন্য তারা যেমন বাইরে গিয়ে 'মুজরো' নাচতেন, তেমনি নিজেদের ঘরেও মাহফিল বসাতেন। তখনকার বাইজিরা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন মহল্লায় মহলে বাইজি দেখা যায় না, তবে দেখা যায় পতিতা বা কলগার্লদের। বাইজিরা নৃত্য দিয়ে আনন্দ দিতো তাদের মুনিবকে কিন্তু এখন নৃত্য নয়, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে পুরুষকে খুশি করে, টাকার বিনিময়ে সময় দেয় পুরুষকে। সত্যিকার অর্থে এই পেশার কিছু পরিবর্তন যেমন এসেছে তেমনি এসেছে বৈচিত্র্যও।

তাহলে প্রশ্ন থাকতে পারে বাইজি আর পতিতা কি একই ? কেউ কেউ এর দ্বিমত পোষণ করলেও অনেকের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে আমি একমত পোষণ করি। বাইজিদের থাকার ব্যবস্থা করতো সম্রাট, সুলতান, বাদশা, রাজা-নবাব ও জমিদাররা। আর পতিতাদের থাকার ব্যবস্থা তারা নিজেরাই করে। বাইজিদের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় আসতো সম্রাট, সুলতান, বাদশা, রাজা-নবাব ও জমিদাররা। আর এখন পতিতাপাড়ায় আসে সব শ্রেণির পুরুষরা। তখন পিতৃপরিচয়হীন হতো বাইজিদের সন্তানরা, এখন পিতৃপরিচয়হীন হয় পতিতাদের সন্তান।

বাইজিদের নিয়ে অনেক তথ্য লিখেছেন আমাদের গবেষকরা, তাঁদের বইতে। মি. শার্লিমান তাঁর বাংলার ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, 'ঢাকার একটি দক্ষ সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্পীর দল ছিল। ঢাকায় ইসলাম খানের দরবারে ১২০০ কাঞ্চনী শোভা পেত।

BanglaBook.org

যাদের পেশা নাচ-গান। এ থেকে অনুমিত হয়, ইসলাম খানের ঢাকা আসার আগেও এখানে গান-বাজনার ব্যাপক চর্চা ছিল। তা না হলে ১২০০ কাঞ্চনীর এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর দরবারে হাজির হওয়া অসম্ভব হতো। এদের জন্য তাঁর বার্ষিক খরচ হতো ৮০ হাজার টাকা।

বন্দি জীবনে থেকে অনেক বাইজি স্বাধীনতার তৃপ্তি পেতে সত্যিকারের প্রেম খুঁজতো। ওদের প্রেমেও পড়েছে অনেক সম্রাট, সুলতান, বাদশা, রাজা-নবাব ও জমিদাররা। কেউ কেই এই প্রেমকে সম্মান দিয়ে পরিবার থেকে দূরেও সরে গেছেন। আবার অনেকে সাহস ও সমাজের ভয়ে ধুঁকে ধুঁকে জীবন যৌবন পার করেছেন। আনন্দ উল্লাসের জন্যে বাইজিদের কাছে গেলেও ওদের নিয়ে সংসার করতে অর্ধাঙ্গিনী করার সাহস দেখিয়েছেন এমন অল্প কিছু ঘটনাও আছে। উপভোগ্য সময় পার করাই ছিলো ওদের আসল উদ্দেশ্য। বাইজিরা শুধু জমজমাট মাহফিল জমিয়ে বা অন্যান্য উপায়ে উচ্চশ্রেণির মনোরঞ্জন করতো।

রঙ মহলে থেকেই সমাজের ভিন্ন উপাধি বহন করতে হতো ওদের। সাজসজ্জা ও ভারি পোশাক-গহনার ভেতরে লুকিয়ে থাকতো ওদের জীবনের পাওয়া না পাওয়ার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না।

সঙ্গীতের জন্য ঢাকার খুব খ্যাতি ছিল, ১৮৫৭-এর পর এই খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পায়। লখ্‌নৌর অনেক বাইজি সংগীতজ্ঞ চলে আসেন মুর্শিদাবাদে এবং পরে ঢাকায়। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চলে বাইজি বা বারাঙ্গনা পাড়া গুলো ক্রমে শান্ত হয়ে যায়। নূপুরের শব্দ, গানের আওয়াজ বন্ধ হয়।

দেশ ভাগ ও জমিদার প্রথার উচ্ছেদ এদের পৃষ্ঠপোষকহীন করে ফেলে। আজ তাদের স্মৃতি রয়ে গেছে শুধু কিছু সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মানুষের অতীত চারণায়, রয়ে গেছে তাদের দুর্লভ ও দুস্প্রাপ্য রংচটা কিছু আলোকচিত্র, যার পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বিস্মৃতির বিষাদময় অনেক ইতিকথা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইজিদের সহায়তা করতেন নবাব পরিবারের বংশধরেরা।

BanglaBook.org

নবাবী প্রথা উঠে যাওয়ার সাথে সাথে বাইজি শব্দটাও উঠে যায়। কিন্তু এই পেশাটা রয়ে যায় ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিবেশে আর ভিন্ন বৈচিত্রে।

বাইজিদের নিয়ে যেমন অনেক লেখালেখি হয়েছে তেমনি অনেক চলচ্চিত্রও। ১৮৭৩ সালে কলকাতার মেয়েরা যখন রঙ্গমঞ্চে আসার অনুমতি পেলেন, তখন নিষিদ্ধ পল্লুর সঙ্গীতে পারদর্শীরাই কিন্তু মঞ্চে এসেছিল। তখন থেকে কুড়ি শতকের ত্রিশের দশক পর্যন্ত প্রায় সকল অভিনেত্রীরাই সুগায়িকা ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারা সুন্দরী থেকে গেলো শতকের আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা পর্যন্ত অনেকেরই নাম চলে আসে। কানন দেবী এখনো অনেকের কাছে খুবই প্রিয়।

বিভিন্ন দশকে বাইজি কেন্দ্রিক বহু চলচ্চিত্র ভারতে তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র পাড়া ও সেই একই ধারায় হেঁটেছে। 'পদ্মপাতার জল' বাংলাদেশে বাইজি কেন্দ্রিক চলচ্চিত্রের প্রেক্ষাপটে পুরোনো কিছু নয়। ঢাকার প্রথম পূর্নাঙ্গ নির্বাক চলচিত্র ছিল 'দ্য লাস্ট কিস'। এই চলচ্চিত্রের নায়িকা ছিল 'ললিতা', তাঁকে বাদামতলীর নিষিদ্ধ পল্লী থেকে নিয়ে আসা হয়। 'দ্য লাস্ট কিস'র সহ নায়িকা চারুবালা আর দেবী বালাকেও আনা হয় পতিতালয় থেকে। কুড়ি শতকের প্রথম দিকে ঢাকার সবচেয়ে বিখ্যাত বাইজি ছিলেন জিন্দাবাহার লেনের দেবী বাইজি বা দেবী বালা। একই সময়ে হরিমতি বাইজি ঢাকায় আসেন, তিনিও এই নির্বাক ছবিটিতে অভিনয় করেন।

'পদ্মপাতার জল' চলচ্চিত্রটিতে রূপায়িত হয় উনিশ শতকের এক জমিদার পুত্রের প্রেমলীলা। রিজোয়ান নামের এই জমিদার পুত্র তার নিজ বাড়ি থেকে দূরের এক শহরের কলেজে পড়তে এসে যুলেশ্বরী নামে বাইজির প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে। একপর্যায়ে রিজোয়ান তার পড়াশোনা, ক্লাস, পরিবার তথা তার জগৎ-সংসারের কথা ভুলে উচ্চমূল্যে দিনের পর দিন বাইজিমহলে দিনযাপন করতে থাকে। অবশেষে এই প্রেম তাদের দু'জনের জীবনেই শেষ পরিণতি হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭২ সালে বলিউডের 'পাকিজাহ' চলচ্চিত্রে বন কর্মকর্তা এক বাইজির প্রেমে পড়ে।

BanglaBook.org

১৯৮১ সালে 'উমরাও জান' চলচ্চিত্রে এক তরুণ নবাবও এক বাইজির প্রেমে পড়ে, প্রেম উদ্যানে তাদের করুণ পরিণতিও সেসব চলচ্চিত্র দেখিয়েছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে অনেক অনেক নারীর জীবন চিত্র তুলে এনেছেন, কিন্তু তিনি কখনোই বাইজি-পতিতা চরিত্র উপস্থাপনে এবং তাদের জীবনের গ্লানি-ক্লেদ-তিক্ততা ও রূঢ়তার বর্ণনা দেননি। ওই পঙ্কিলতার কোনো ছবি আঁকতে আগ্রহী হননি তিনি; বরং তাদের প্রেম, প্রেমের একনিষ্ঠতা ও সেবাপরায়ণতার চিত্র তুলে ধরেছেন বিভিন্ন ভাবে।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পিয়ারী বাইজি বাল্যপ্রণয়ের টানে আজীবন শ্রীকান্তনিষ্ঠ হয়ে থাকে, অন্যদিকে সাবিত্রী-সতীশের মধ্যে চলে প্রেমের নানা খেলা। চন্দ্রমুখী অনুরক্ত হয়ে থাকে দেবদাসের প্রতি, বিজলী সত্যেন্দ্রের প্রেমে বাইজি পেশা ছেড়ে দিয়ে বলে....'যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্যি উঠলে রাত্রি মরে-আজ সেই রোগেই তোমাদের বাইজি চিরদিনের জন্য মরে গেল।'

কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এই বারবণিতারা ব্যক্তিবিশেষের আস্থাভাজন হয়, কিন্তু সামাজিক সম্মান অর্জন করে না-সমাজের সঙ্গে তাদের কোনো টানাপোড়েন তৈরি হয় না। তাদের স্বাতন্ত্র্য-ব্যক্তিত্ব-অস্তিত্বের লড়াই বিলীন হয়ে যায় কোনো এক পুরুষের মধ্যেই। প্রেমের সামাজিক স্বীকৃতি সম্ভব হয় না বলেই শরৎচন্দ্র লিখেছেন...'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না, ইহা দূরেও ঠেলিয়া দেয়।'

বাইজিদের সম্পর্কে অনেক তথ্যবহুল লেখা উপহার দিয়েছেন হাকিম হাবিবুর রহমান, গনিউর রাজা, সৈয়দ তৈফুর, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন, নাট্যকার সাঈদ আহমদ, অনুপম হায়াৎ, শিল্পী পরিতোষ ও সত্যেন সেন। বাইজি নাচ ও খেমটা নাচ সেকালে ঢাকার মানুষদের জীবনের অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কবি নবীন চন্দ্র সেন তার ছেলের বিয়েতে ঢাকা থেকে বাইজি আনতে পেরে গর্ব অনুভব করেছিলেন। গান আর নাচে খুব দক্ষ না হলে সে কালে ভাল বাইজি হওয়া যেত না আর তার সাথে অবশ্যই থাকতে হত রূপের মোহও।

BanglaBook.org

গঙ্গাজলির অধিকাংশ বাইজি বিষ্ণু উপাসনা করতো। প্রতিদিন সকালে গঙ্গাজলি থেকে স্নানের জন্য দল বেঁধে বুড়ি গঙ্গায় যেতেন। গোসল সেরে বুকে গামছা জড়িয়ে কোমরে পিতলের কলসি নিয়ে সিক্ত ভূষনে বাইজিরা লাইন দিয়ে ফিরে আসতেন। এ দৃশ্য উপভোগ করতে কৈশরে বন্ধুদের নিয়ে ওয়াইজ ঘাট এলাকায় যেতেন নাট্যকার সাঈদ আহমেদ।

শিল্পী পরিতোষ সেন ও ভুলে যাননি সিক্ত বসনে বাইজিদের ঘরে ফেরার দৃশ্যর বর্ননা দিতে। তিনি নিজের আত্মজৈবনিক রচনা বইতে জিন্দাবাহারে এক হরিমতি বাই সম্পর্কে লিখেছেন, 'হরিমতি বাইজির ঘরটি আমাদের বারান্দা থেকে পরিষ্কারই দেখা যায়। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো ভৈরবী রাগে গান ধরেছেন, 'রসিয়া তোরি আখিয়ারে জিয়া লালচায়' ঠুংরি ঠাটের গানের এ কলিটির সুরের মাধুর্য্যে আমাদের জিন্দাবাহার গলিটি কানায় কানায় ভরে উঠেছে।'

একবার খেতরীর রাজার সভায় উপস্থিত হন স্বয়ং বিবেকানন্দ। সভায় একজন বাইজি গান গাইবেন, একে তো স্ত্রীলোক তায় আবার বাইজি বিবেকানন্দ গান শুনতে অস্বীকৃতি জানালো, কিন্তু রাজার অনুরোধে গান শুনতে বসলেন।

বাইজি গাইলেন,'প্রভু মোর অবগুন চিতনা ধর / সমদরশি হ্যায় নাম তোমার/এক লহো পুজামে রহত হ্যায়/এক রহো ঘর ব্যাধক পরো/পরলোক মন দ্বিধা নাহি হ্যায়/ দুই কাঞ্চন করো।'

গান শুনে বিবেকানন্দের চোখে পানি চলে আসে। এরপর সেই বাইজিকে বিবেকানন্দ মা বলে সম্বোধন করেন। যারা মানুষের আনন্দের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দিতেন সমাজ তাদের দিতো নিত্য বঞ্চনা। সুরের জাদুতেও অনেক বাইজি বশ করতেন শ্রোতাদের। তাদের একজন হলেন মোশতারী বাই।

একটা সময় ছিলো আমাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করাতে হলে বাবার নামই ছিলো প্রধান একটা বিষয়। এরপরে এলো বাবার নামের সাথে মায়ের নামও দেয়াটা বাধ্যতামূলক। সমাজ বদল হচ্ছে, সামাজিক অবকাঠামো বদল হচ্ছে আমার বিভিন্ন দিক দিয়ে।

BanglaBook.org

বর্তমান সরকার নিয়ম করেছে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সন্তানকে স্কুলে ভর্তির সময় যদি বাবার নাম না দেয়া যায় তাহলে শুধু মায়ের নাম দিয়েই সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করানো যাবে। মায়ের পরিচয়েই সন্তান বড় হতে পারবে। সমাজে পরিচয় দিতে পারবে। উচ্চবিত্ত নিম্নবিনতেই বাবার পরিচয় নেই এমন অনেক শিশুকে পরিস্থিতির শিকার হয়ে মরতে হয়েছে, মেরে ফেলেছে।

সে সময়ে বাইজিদের ঘরে যে কন্যা সন্তানের জন্ম হতো তাদেরকেও বাইজি পেশায় যেতে হতো। কারণ বাইরের পরিবেশের সাথে তাদের চলন-ফেরন মিলতো না। আর ওদের জন্যে শিক্ষা ব্যবস্থাও ছিল না। দিন বদলের সাথে যখন বাইজিদের পেশা বন্ধ হতে থাকে তখন ভিন্ন ভাবে গড়ে উঠে এই পেশা। যারা আনন্দ উল্লাসের জন্যে যাতায়াত করতো বাইজি পাড়ায়, তারাও নতুন পথের খোঁজে নামে। নামের ভিন্নতা যেমন এসেছে, তেমনি সমাজের কাছে ওদের পরিচয়ের ভিন্নরূপ ফুটে উঠেছে।

সেই সময় যে বাইজিদের উচ্চাবিলাসী জীবন ছিল তারা গুঞ্জনের মাঝে পড়ে নৃত্য কলাকে বাদ দিয়ে শরীরের বিনিময়েই পেশাকে ধরে রাখে। বাইজিদেরও সন্তান হতো, সে সব সন্তানদের যেমন কটু চোখে দেখা হতো তেমনি পতিতাদের সন্তানদের দেখা হয় কটু চোখে। যার কারণে এই সব সন্তানদের নিয়ে ওরা সমস্যায়ও পড়তো। নিজের পেশায় নিতে রাজি হতো না। অন্যদিকে লেখাপড়ায়ও আসতো বাধা। অনেকে তাদের সন্তানদের স্বাভাবিক জীবন দিতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছে বলেই এই নিয়ম করা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

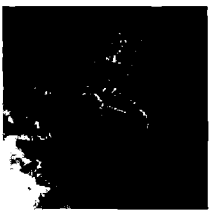

নান্দীকারের নাটক : নাচনি

শান্তি সিং

বীরঙ্গনা গৃহবধূ কিংবা বারবধূ সবাই নিজের মোহিনী শক্তিতে পুরুষের চিত্তজয়ী। 'নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা/ বিদ্যুৎ চঞ্চলা' উর্বশী থেকে চর্যাপদে-বর্ণিত চৌষট্টি পদ্ম পাপড়িতে নৃত্যরতা ডোমনি, পুরুষচিত্তে জাগান চাঞ্চল্য। খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে উৎকীর্ণ-শিলালিপিতে আছে সুতনুকা নামে দেবদাসীর কথা। তাঁকে কামনা করেছেন, দেবদত্ত নামে এক রূপদক্ষ ভাস্কর। একদা 'দেবদাসী' নামের নৃত্যগীতদক্ষা সুন্দরীরা দেবতার মনোরঞ্জনের সঙ্গে রাজশক্তিরও মনোরঞ্জন করেছেন। বৌদ্ধ অবদানশতকে নগরনটী বাসবদত্তার কথা জানি। রাজস্থানিদের কাছে 'বাই' মানে বোন। মারাঠি ভাষায় 'বাই'-এর অর্থ মা কিংবা বড় বোন। তার সঙ্গে সম্ভ্রম বা আদরার্থে 'জি' প্রযুক্ত। তখন হয়, বাইজি। অথচ নৃত্যকলা জগতে 'বাইজি' শব্দটি অনেকের কাছে হীনার্থক। ইন্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষের দাবি, রাজা নবকৃষ্ণ দেব (১৭৩২-৯৭) কলকাতায় বাইজি নাচ প্রথম চালু করেন। মূলত

BanglaBook.org

১৩৮ ঢাকার বাইজি উপাখ্যান

সাহেবসুবাদের মনোরঞ্জন করে খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জনের জন্য। 'বাইজি'র সমার্থক শব্দ : খেমটাওয়ালি, তয়ফাওয়ালি, গশ্‌ত, জান, নাচনি বা নচ-গার্ল ইত্যাদি। রাজা রামমোহন রায়ের মানিকতলার বাগানবাড়িতে পরমাসুন্দরী নিকি অতুলনীয় নৃত্যছন্দের সঙ্গে মধুর নিক্বণে, ফ্যালি পার্কসেরও চিত্তজয় করেন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর একদা সরস্বতী বাইজির সংগীতসুধা পানে মুগ্ধচিত্ত হয়েছেন, তা জানি জোড়াসাঁকোর ধারে বই থেকে। কলকাতার গহরজান, কৃষ্ণভামিনীর মতন ঢাকায় ছিলেন আমিরজান, রাজলক্ষ্মী, গোবিন্দ রানি প্রভৃতি বিখ্যাত বাইজি। সংগীতবিদ অমিয়নাথ সান্যাল (১৮৯৫-১৯৭৮) আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, 'এতো বড় বড় বাইজি, যাঁদের লোকে ঘৃণা করে, আমার মতে তাঁরা এক-একজন গান্ধর্বী।' কলকাতায় নান্দীকার গোষ্ঠীর প্রযোজনায় নাটক নাচনি। দর্শকচিত্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া জাগিয়েছে। সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের রসিক উপন্যাস অবলম্বনে নাটক-সংগীত-নির্দেশনায় আছেন পার্থপ্রতিম দেব। অভিনয়ে আছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, স্বাতীলেখা সেনগুপ্ত, দেবশঙ্কর হালদার, সোহিনী সেনগুপ্ত, সুমন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, সর্বানী ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে।

কলকাতার অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্রসদন, মধুসূদন মঞ্চ, গিরিশমঞ্চ, স্টার থিয়েটারে চলছে নির্ধারিত দিনে এই নাটক। নান্দীকারের এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁদের নান্দনিক প্রয়াসে, মহানগরী কলকাতার শিল্পপ্রিয় নরনারীরা আগ্রহ নিয়ে দেখছেন নাটকটি। দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার নাচনি নাচ ও ঝুমুর গান সম্পর্কে তৈরি হচ্ছে বিশেষ ধারণা। এই জন্যই নাচনি নাচের দেশ ও কাল সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

'ঘন রসময়ী' বাংলাদেশ। তার পাশেই পশ্চিম বাংলার সুজলা-সুফলা কিছু অঞ্চল। তার দক্ষিণ পশ্চিমে, রাঢ়ভূমি-সংলগ্ন ছোট নাগপুর মালভূমিতে একদা ছিল মানভূম জেলা। হিন্দি ভাষা-বলয় বিহার রাজ্যের অন্তর্গত। স্বাধীনতা-উত্তর ভাষাতে, মানভূম জেলার পুরুলিয়ায়, বাংলা ভাষার দাবিতে ভাষা-আন্দোলন ক্রমশ প্রবল হয়।

BanglaBook.org

লোকসংগীত টুসুগান গেয়ে চলে ভাষা-আন্দোলন ও টুসু-সত্যাগ্রহ। কারণ, জনগণনায় পুরুলিয়ার তখন ৮৭ জন মানুষ বাংলা ভাষাভাষী। অবশেষে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশে, ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর, পুরুলিয়া জেলার বঙ্গভুক্তি। মানভূম আজ মনোভূমে। তবু পুরুলিয়ার বাংলা ভাষাভাষী মানুষ আজো বলেন, মানভূম তো গান-ভূম! বাংলা লোকসংগীতের ভূমি। এই মানভূম-পুরুলিয়ায় একদা নাচনি নাচ খুবই জনপ্রিয় ছিল। অষ্টাদশ শতক থেকে বিশ শতক।

এই মানভূমের জমিদার শ্রেণির 'বাবু' সম্প্রদায়, কলকাতার 'বাবু' সম্প্রদায়ের মতন নাচনি নাচে বিনোদন খুঁজতেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের নৃত্যগীতপ্রীতির অন্তরালে ছিল কাম-প্রবৃত্তির অভিনব চরিতার্থতা। কেউ কেউ লক্ষ্ণৌ থেকে নৃত্যগীতকুশলা বাইজি আনাতেন। তবে অধিকাংশ জমিদার বা ঘাটোয়াল আড়কাঠি-মারফত যৌবনবতী সুন্দরী জোগাড় করতেন। প্রশিক্ষক দিয়ে গ্রাম্যললনাদের নৃত্যগীতে নৈশ-আসরের উপযোগী করে নিতেন। মানভূমের পঞ্চকোটরাজের আসরে একসময় নাচনি নাচতেন, ঝুমুর গাইতেন, কোকিলকণ্ঠী সিন্ধুবালা। গড় জয়পুররাজ, বাঘমুন্ডিরাজ প্রমুখ রাজা-জমিদারের মতন ইচাগড়ের রাজা উদয়াদিত্য দেব নাচনি নাচের সমঝদার ছিলেন।

তাঁর সভাকবি ছিলেন রামকৃষ্ণ গাঙ্‌গুলি (১২৮৮-১৩৪৮)। তিনি ছিলেন ঝুমুর কবি ও উচ্চাঙ্গ ঝুমুরশিল্পী। তাঁর বৈঠকি ঝুমুর (classical thumur) যৌবনরাগ-সংরক্ত চটুল গান ছিল না। অথচ নাচনি নাচের আসরে কামনামদির তরল ঝুমুর গান চলত। নাচনি নাচে নতুন মাত্রা (dimension) আনেন ঝুমুর কবি ও ঝুমুরশিল্পী রামকৃষ্ণ গাঙ্‌গুলি। তাঁর ছিল সুভ্রদা, বিধুমুখী ও বেলা নামের তিনজন নাচনি। ব্রাহ্মণসন্তান রামকৃষ্ণ কুলীন সমাজে 'পতিত' হন। তবু ইচাগড় রাজার রাসলীলায় একুশজন নাচনি নিয়ে তিনি ঝুমুরগান পরিবেশন করেন। মানভূম-পুরুলিয়ার মাজি, মুড়া, ঘাসি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ 'বাবু' সম্প্রদায়ের অনুকরণে নাচনি-পোষা শেখেন। এখনো তাঁরাই নাচনি নাচের ধারাটি বাঁচিয়ে রেখেছেন।

BanglaBook.org

তার প্রধান দুটি কারণ– ১. স্ত্রী-সংসর্গের অতিরিক্ত ফুর্তিলাভ। ২. নাচনি-নাচিয়ে কাঁচা পয়সা রোজগার। এখানে গাঁয়ে থাকে একাধিক পাড়া বা টোলা। সেখানে গাঁয়ের মানুষ বাস করেন। সেখান থেকে কিছুটা দূরে একসময় থাকত নাচনির ঘর। সেখানে সান্ধ্য-আসর। নাচ-গান, ফুর্তি। নাচনির ওপর 'রসিকে'র অধিকার। সে-ই নাচনির মালিক। নাচনির সঙ্গে 'রসিকে'র গান্ধর্ব-সম্পর্ক। 'রসিকে'র স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে বৈধ সামাজিক সম্পর্ক। 'রসিকে'র বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী স্ত্রী ও সন্তানরা। নাচনির সেখানে কোনো বৈধ অধিকার নেই।

নাচনি-সহবাসে পিতৃত্বের দাবি মানতেন না 'রসিক'। তাই নাচনির গর্ভসঞ্চার হলেই তাকে নষ্ট করে দিতেন। নাচনির মৃত্যু হলে একদা সামাজিক সৎকার হতো না। মৃতা নাচনির পায়ে দড়ি- বেঁধে, ডোম সম্প্রদায়ের লোক অমানবিকভাবে মৃতদেহ টেনে নিয়ে যেত ভাগাড়ে, অর্থাৎ উপশল্য স্থানে। নাচনির মৃতদেহ তখন শকুন-শেয়ালের খাদ্য হতো। সবিশেষ উল্লেখ্য, এই বীভৎস সামাজিক রীতি বর্তমানকালে অবলুপ্তপ্রায়। ১৯৬৬ সাল থেকে ২০০৭ সাল অবধি একটানা একচল্লিশ বছর পুরুলিয়ায় বাস করেছেন এই প্রতিবেদক।

সুদীর্ঘরকাল ঝুমুরগান ও নাচনী-নাচ নিয়ে ব্যপ্তগভীর ক্ষেত্র সমীক্ষা (field surve) করার সুযোগ হয়েছে। মানবাজার থানার মাঝিহিড়া গাঁয়ের একদা লাস্যময়ী নাচনি গীতারানির ঘরে গিয়ে সাক্ষাৎকার নিয়েছি। 'রসিক' নিবারণ মাহাতোর সঙ্গে দেখেছি তাঁর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক। তাঁদের একমাত্র সন্তান পুষ্পবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী।

স্কুল-হোস্টেলে থেকেই তার তখন পড়াশোনা। বাংলা, ঝাড়খন্ড, বিহার, ওড়িশার তখন নামকরা নাচনি, লাস্যময়ী সুন্দরী মালাবতী। পুরুলিয়া শহর থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল প্রত্যন্ত অঞ্চল হেটজারি গাঁয়ে, সারারাত নাচনি নাচের আসর। তাঁর নাচনি নাচ শেষ হলে সাক্ষাৎকার নিয়েছি। তাঁর 'রসিক' তথা স্বামী বাউরিবন্ধু মাহাতো পাশে দাঁড়িয়ে। কথা প্রসঙ্গে জেনেছি মালাবতী সন্তানবতী জননী এবং স্বামীসংসর্গে সুখী।

BanglaBook.org

মানভূম-পুরুলিয়ার বিখ্যাত ঝুমুরশিল্পী ও নাচনি সিন্ধুবালা। পাহাড়ের মালা-গাঁথা দুর্গম বান্দোয়ানে জন্ম। কিশোরী কৃষ্ণকলিকে আড়কাঠি দিয়ে লুট। বারবার পুরুষ বদলেছে। ক্ষমতার তাল ফেরতায়। শেষে বাঘের মতন মহেশ্বর মাহাতো। ডাক নাম চেপা।

তাঁর নাচনি ছিল একাধিক। সেরা নাচনি সিন্ধুবালা। চেপা 'রসিক'। তাঁর নাচনি চেপী। সিন্ধুবালার ডাকনাম। চেপা মাহাতো হঠাৎ খুন হন। তাঁর বিষয়সম্পত্তি পেয়েছেন বৈধ স্ত্রীর কন্যা খাঁদুবালা। সিন্দুবালা কিছুই ভাগ পাননি। অথচ মহেশ্বর মাহাতোর ভাইপো হৃষিকেশ মাহাতোর কাছে আমৃত্যু আশ্রয় পেয়েছেন সিন্ধুবালা। সেই আশ্রয় ও সম্মানের কথা শিল্পীর মুখে বহুবার শুনেছি। হৃষিকেশ মাহাতোর ছেলে বিকাশ। স্থানীয় পুয়াড়া স্কুলে কিছুদিন পড়েছেন। শিখেছেন গানবাজনা। তিনি তন্বী সুন্দরী নাচনি জ্যোৎস্নার 'রসিক' ও স্বামী।

হৃষিকেশ মাহাতোর ঘরে ছেলে ও বউমাকে সেই সময় থাকতে দেখেছি। দুই উনিশ-বিশ শতকে, মানভূম-পুরুলিয়ায় নাচনির সামাজিক মর্যাদা ছিল না, তবু 'রসিকে'র ছেলে বা মেয়ের মুখ 'নাচনি-মা' কথাটি শোনা যেত। 'রসিকে'র ছেলে কখনো নাচনি-মাকে নিজের নাচনি হিসেবে দেখত না। নাচনি-মায়ের সঙ্গে গান্ধর্বসম্পর্ক পাততো না। তা সামাজিক রীতিবিরুদ্ধ অনৈতিক-গর্হিত বিষয় হিসেবে দেখা হতো। অথচ নান্দীকারের নাচনি নাটকে দেখা যায়, 'রসিক' ধ্রুবকুমার মঞ্চে গরহাজির। তাঁর নাচনি মঞ্চে নাচছেন। ঢোল বাজাচ্ছেন 'রসিকে'র পিতা।

নাচনি স্বাতীলেখা গাইছেন ঝুমুর। সঙ্গে নাচনি নাচ। নাটকের কাহিনি অগ্রসর হয়। মঞ্চে আসেন 'রসিক' ধ্রুবকুমারের পুত্র পান্ডবকুমার। তিনি 'রসিক' হন। নাচনি-মায়ের সঙ্গে গান্ধর্ব-সম্পর্কের কথা বলেন। তারপর নাচনি-মায়ের সঙ্গে 'রসিক' পান্ডবকুমার চরিত্রে দেবশঙ্কর হালদার নাচেন। তাঁর পরনে নেই 'রসিকে'র প্রথাসম্মত ধুতি-পাঞ্জাবি। গলায় নেই উত্তরীয় বা গামছা। প্যান্ট শার্ট-পরিহিত 'রসিক' দেবশঙ্কর প্রগলভ ভঙ্গিতে অভিনয় করেন।

BanglaBook.org

তাঁর মুখে ঠিকমতো ফোটে না, মানভূঁইঞা-কথা, যা আঞ্চলিক উপভাষা। অতিনাটকীয়তা দিয়ে আসর জমাতে চান তিনি। 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত' ও 'নিঃসঙ্গ সম্রাট'-খ্যাত অভিনেতার এই অভিনয়ে লালমাটির দেশের লোকজীবন অধরা থেকে যায়। স্বাতীলেখার উচ্চারণ রীতিতেও যথেষ্ট ত্রুটি দেখা যায়। তবু বিগতযৌবনা নাচনির অভিনয়ে তিনি আন্তরিক। নাচনি বিজলিবালার চরিত্রে সোহিনী সেনগুপ্ত যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। টাঁড়-বাইদের দেশ মানভূম-পুরুলিয়া।

সেখানে নিম্নবর্গের নারী জীবনের দৈন্য-দারিদ্র্য এবং তার ক্ষোভ-হতাশার মাঝে সুখী সংসার জীবনের রঙিন হাতছানি মানবিক রূপে-রসে সোহিনীর অভিনয়ে ফুটে ওঠে। অপহৃত যুবতী বিজলিবালার উদ্ধারকালে, মঞ্চে ভূষাকালিমাখা দলবদ্ধ যুবতীদের প্রতীকী নৃত্য, এবং পুরুষদের রণপা-নৃত্য, অভিনব সফল সংযোজন। ঝাঁটা-হাতে বিজলিবালার ঘরে ঝাড়ু দেওয়ার সময় কুলুঙ্গিতে-বসানো ঠাকুরের সামনে ঝাড়ু- দেওয়ার দৃশ্য চোখে লাগে। শুধু তাই নয়, ঝাঁটাকে দুহাতে ধরে, তাকে লৌকিক দেবী ভাদুরূপে কল্পনায়, আবেগে ভাদুগান-গাওয়া 'রসাভাস' ঘটায়। কারণ, ভাদুদেবী মানভূমের লোকজীবনে কাশীপুর রাজার কন্যা ও জননী।

নাটকের শেষ দৃশ্য অত্যন্ত দক্ষ অভিনয়ে সোহিনী সেনগুপ্ত ফুটিয়ে তোলেন। মৃতা নাচনি পান্ডবকুমারের জননী। মৃতা নাচনির 'রসিক' রুদ্রপ্রসাদ। শোকস্তব্ধ। তখন মৃতা নাচনির পায়ে দড়ি-বাঁধা বীভৎস প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদিনী হন বিজলিবালা। তাঁর যুগপৎ শোক ও ক্রোধের মানবিক প্রকাশে, দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ ও অশ্রুসজল। ক্রোধোন্মত্ত বিজলিবালার অভিনয়ে সোহিনী সেনগুপ্ত অনন্যা শিল্পী। সাধুবাদ পাবেন নিশ্চিত।

পরিশেষে নিবেদন : একুশ শতকের প্রথম পাদে, মহানগরী কলকাতা থেকে অনেক দূরবর্তী স্থান লালমাটির দেশ মানভূম-পুরুলিয়া। সেখানে একদা সামন্ততান্ত্রিক প্রথায়, দারিদ্র্যক্লিষ্ট তথা অমানবিক নারী জীবনের অশ্রুসজল দিকটি সমাজ জীবনে যে বীভৎস ক্ষত সৃষ্টি

BanglaBook.org

করেছিল, তার ইতিবৃত্তকথা নাটকের গোড়ায় বা শেষে দু-চার কথায় নিবেদন করলে, তৎকালীন দেশ-কাল-সমাজের প্রেক্ষিত নাগরিক দর্শককুলের ধারণায় যথার্থ প্রতীতি ও নতুন অভিঘাত জাগাত, সমাজবিজ্ঞানের আলোয়।

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org